সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে গণহত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় মানুষ।


# সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

ভেনেজুয়েলায় কারাকাসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমাবেশ


ফেব্রুয়ারি'২০১৯ ■ ৪৭তম বর্ষ ■ দশম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা


## এ আই এস জি ই এফ-এর ডাকে রাজধানীতে কর্মচারী জমায়েত

দিল্লীর জমায়েতে বক্তা সি আই টি ইউ নেতা এ কে পদ্মনাভন

বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে নয়াদিল্লীর পার্লামেন্ট স্ট্রিটে অবস্থান জমায়েত কর্মসূচী সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নয়া পেনশন ব্যবস্থা বাতিল করা এবং অস্থায়ী ও চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা প্রদান করো মূলত এই দুদফা দাবিতে এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। প্রায় প্রতিটি রাজ্য থেকে কয়েক হাজার কর্মচারী এই জমায়েতে শামিল হন। দিল্লীর পাশ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে আগত কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল বেশী। দূরবর্তী রাজ্যগুলি থেকে নির্ধারিত সংখ্যক কর্মচারী উপস্থিত হন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৩ জন মহিলাসহ ৩৫ জন প্রতিনিধি এই জমায়েতে সামিল হন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহর নেতৃত্বে। যন্তর-মন্তর থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধিরা মিছিল সহযোগে এই কর্মসূচীতে শামিল হন। লাল টুপি এবং লাল ফেট্টিতে সুসজ্জিত ছিলেন প্রত্যেকে। স্লোগান মুখরিত এবং অত্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষক সজ্জায় সজ্জিত ৩৫ জন প্রতিনিধির এই মিছিল সমাবেশে উপস্থিত সকলেরই শুধু নয় পথ চলতি সাধারণ মানুষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিক্ষোভ সমাবেশ চলে সকাল ১১টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত। সমাবেশ উদ্বোধন করেন সিআইটিইউ-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি এ কে পদ্মনাভন। উদ্বোধক বলেন, ৮-৯ জানুয়ারি সর্বভারতীয় ধর্মঘটে কেন্দ্রীয় সরকারকে জোর ধাক্কা দিয়েছে দেশের শ্রমিক-কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ। এই সমাবেশের দাবিগুলিও দীর্ঘদিনের কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা উপেক্ষা করে চলেছে। তিনি বলেন, এই সংগ্রাম যেমন জারি থাকবে তেমনি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিকল্প নীতির সরকার গঠনের যে সংগ্রাম তাতেও শামিল হতে হবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সারা দেশের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটকে সফল করার জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি নয়া পেনশন ব্যবস্থার বিপদের দিকগুলি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত কর্মচারী ও অস্থায়ী কর্মচারীদের সংগঠিত করার উদ্যোগ রাজ্যে রাজ্যে কর্মচারী সংগঠনগুলিকে নিতে হবে।

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সহকারী

সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, যে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে মাতৃভাষা রক্ষার জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছিলেন মানুষ। এই বিশেষ দিনে এই দেশের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও পথে নেমেছে তাদের দাবিত। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের ভয়ংকর আক্রমণের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে সংগ্রাম করছে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। নেতৃত্ব দিচ্ছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এত হুমকির মধ্যেও ৮-৯ জানুয়ারি ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন কর্মচারীরা। আগামী দিনে আরও বৃহত্তর সংগ্রামে শামিল হবেন তারা।

এছাড়াও সমাবেশে বিভিন্ন রাজ্যের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়। দাবিগুলি নিয়ে আরও বড় আন্দোলনে সামিল হবার শপথ নিয়ে শেষ হয় কর্মসূচী। □

## আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯

## নয়া উদারবাদ, মনুবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একত্রিত হোক আমাদের সংহতি

কেন্দ্রীয় কর্মসূচীতে বক্তা ভারতী মুৎসুদ্দী

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে বিগত ৮ মার্চ ২০১৯ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হলো ১০৯-তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ বছর "নয়া উদারবাদ, মনুবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একত্রিত হোক আমাদের সংহতি"—স্লোগানকে সামনে রেখে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নারীদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সদা প্রতিবাদী বিশিষ্ট নেত্রী তথা আইনজীবী ভারতী মুৎসুদ্দি। তিনি তাঁর বক্তব্যে দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির বাড়বাড়ন্ত এবং নারীদের মনুবাদী সমাজে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসের তীব্র নিন্দা করেন। একই কায়দায় রাজ্যে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতায় বৃদ্ধি পাচ্ছে হিন্দু এবং মুসলিম—উভয় মৌলবাদ। নয়া উদারনীতি এই মৌলবাদের ধারক ও বাহক। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে গত আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পথ অনুসরণ করার ফলে, খেটে খাওয়া মানুষের কাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। হ্রাস পাচ্ছে মজুরী বৃদ্ধির হার। এইপ্রক্রিয়ায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন নারী শ্রমিকরা। এখনও আমাদের দেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মজুরী বৈষম্য বর্তমান।

রাজ্যে নারীদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের সমস্ত মানুষকে এক হয়ে লড়াই করার আহ্বান জানান। আগামী রাজনৈতিক সংগ্রামে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা এবং রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। সভায় কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন আহ্বায়িকা সুতপা হাজরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ সভানেত্রী গীতা দে। অর্ধ দিবস ও পূর্ণ দিবস ছুটি নিয়ে দুই শতাধিক কর্মচারী এই কর্মসূচীতে যোগদান করেন, যাঁদের অধিকাংশই মহিলা। □


জেলার সংবাদ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়


## সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

৩০-৩১ মার্চ, ২০১৯ অনুষ্ঠিতব্য অষ্টম কাউন্সিল সভার পূর্বে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, গত ৯ মার্চ, কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য। ঐ দিন বেলা ১২ টায় শোকপ্রস্তাব পাঠ ও নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রেক্ষিতে সমকালিন পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ, বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা এবং আগামী কর্মসূচীর প্রস্তাবনা সম্বলিত প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতিগুলির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন। সমগ্র আলোচনাকে গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য রাখেন যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আলোচিত বিষয় ও গৃহীত প্রস্তাবনা সমূহ— □ ২৯ নভেম্বর, ২০১৮ নবান্নে বিক্ষোভ কর্মসূচীর পরবর্তী পর্বে, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক সহ ১৫ জন শীর্ষ নেতৃত্বকে মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং জেলার প্রত্যন্তপ্রান্তে প্রতি হিংসামূলক বদলি করে সরকার সংগঠনকে দুর্বল করার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু তা হয়নি। এই সময়কালে সাধারণ ধর্মঘট, বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতির সম্মেলন, প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচী, সমিতিগত দাবি দাওয়া ভিত্তিক ডেপুটেশন কর্মসূচী সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়েছে। বদলি হওয়া নেতৃবর্গ এতটুকু হতোদ্যম না হয়ে বারংবার ব্যক্তিগত ছুটি নিয়ে সমস্ত কর্মসূচীতে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করছেন। □ ৮-৯ জানুয়ারি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। সারা দেশে ২০ কোটি শ্রমজীবী মানুষ এই ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন। ১১টি রাজ্যে ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক। অন্যান্য রাজ্যেও ব্যাঙ্ক-বীমা সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পরিবহন ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। পশ্চিমবাংলায় শাসকের রক্তচক্ষু, পুলিশ প্রশাসন ও শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনীর যৌথ হুমকি ও আক্রমণকে মোকাবিলা করে শ্রমজীবী মানুষ রাস্তায় নেমে ধর্মঘট সফল করেছেন। এবারের ধর্মঘটে শ্রমিক কর্মচারীদের লড়াইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কৃষকরা। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর নজির সৃষ্টি করেছিল এবারের ধর্মঘট। □ সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য ব্যাপক প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। জেলা/অঞ্চল ও সমিতি ভিত্তিক কর্মীসভা, দপ্তরে দপ্তরে সাধারণ সভা, লিফলেট বিতরণ, পোস্টারিং ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মঘটের কেন্দ্রীয় ১২ দফা দাবি এবং রাজ্য কর্মচারীদের নিজস্ব ২ দফা দাবিকে কর্মচারীদের কাছে নিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এছাড়াও ধর্মঘট উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং ১২ই জুলাই কমিটি আহুত কনভেনশন, মিছিল ও সমাবেশের কর্মসূচীতে সংগঠনের ডাকে কর্মচারীরা অংশ নিয়েছিলেন। সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকা সহ বিভিন্ন সমিতির মুখপত্রকে ধর্মঘট কেন্দ্রীক প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যথারীতি বেতন কাটা ও ডাইস-নন এর সার্কুলার জারি করে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছিল। শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনীর হুমকি এবং সরকার অনুগত কর্মচারী সংগঠনগুলির নেতিবাচক ভূমিকা তো ছিলই। এতদ্‌সত্ত্বেও ২০১২ সাল ও তার পরবর্তী ধর্মঘটগুলির তুলনায় এবারে অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। □ ধর্মঘটের সাফল্যকে সংহত করেই আগামী রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে হবে। একদিকে নির্বাচন কর্মী হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব প্রতিপালন, অপর দিকে নির্বাচকমণ্ডলীর অংশ হিসেবে পরিবার পরিজন সহ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ—এই দ্বিবিধ দায়িত্ব পালনে সংগঠনের অতীতের পরম্পরাকে রক্ষা করতে হবে। □ রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরে এবং বিশেষ করে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচনী কর্মীদের যে সন্ত্রাসের পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল, তা স্মরণে রেখে নির্বাচনী কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেওয়া হবে। □ ২৯ নভেম্বর ২০১৮ নবান্নে বিক্ষোভ কর্মসূচীর পরবর্তী পার্বে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সারা রাজ্য জুড়ে দপ্তরে দপ্তরে সাধারণ সভা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং জেলা ও অঞ্চল ভিত্তিক সেই সমস্ত প্রস্তাব রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। □ বিভিন্ন সমিতির সদস্য সংগ্রহের কাজ এবং সংগ্রামী হাতিয়ার, এমপ্লয়িজ ফোরাম সহ নিজস্ব মুখপত্রের গ্রাহক সংগ্রহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। □ বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিবর্তন, বকেয়া দাবি আদায় ও অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য আগামী ১০-১১ এপ্রিল ২০১৯ ধর্মতলার লেনিন মুর্তির সামনে ৪৮ ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচীর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এই বছরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হবে সংগঠনের উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলন উপলক্ষে সংগঠন-সম্মেলন তহবিল সংগ্রহের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। □ জনবিরোধী, সাম্প্রদায়িক মোদী সরকারকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারণ, জনবিরোধী ও স্বৈরাচারী রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের ক্ষোভকে সংহত করা এবং সংসদে জনগণের প্রকৃত কণ্ঠস্বরকে জোড়ালো করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

উপরোক্ত সমস্ত প্রস্তাবনা আগামী ৩০-৩১ মার্চ ২০১৯ অষ্টম রাজ্য কাউন্সিলে আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হবে। □

# সম্পাদকীয়

## বিকল্পের সন্ধানে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংলন্ডের মতন দেশগুলি, যেখানে সাধারণভাবে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে, সে দেশের মানুষ যখন কোন নির্বাচনে ভোট দিতে যান, তখন তাঁদের সামনে বিকল্প থাকে একটিই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রিপাব্লিক্যানদের কাজ পছন্দ না হলে ডেমোক্র্যাটরা, আর ইংলন্ডের ক্ষেত্রে কমজারভেটিভদের কাজ পছন্দ না হলে লেবর পার্টি। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই দলগুলি ঘোষিত অবস্থান অনুযায়ী নিজ নিজ দেশে পরস্পরের বিরোধী দল হলেও, নীতি ও কর্মসূচীগত বোঝাপড়ার নিরিখে একের সাথে অপরের কার্যত কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য ততটুকুই যতটুকু পৃথক দলের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয়। পরস্পর যুযুধান দলগুলির নীতি ও কর্মসূচীগত সাদৃশ্যের কারণে, যেকোন নির্বাচন সরকারের চরিত্রে খুব বড় ধরনের কোন পরিবর্তন নিয়ে আসবে, এমন প্রত্যাশা সে দেশের মানুষের নেই। তাই ঐ দেশগুলিতে যেকোনো নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার বেশ কম। অধিকাংশ সময় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ভোটই দেন না, (ব্রেক্সিট-র মতন ব্যতিক্রমী চরিত্রের গণভোট বাদ দিলে)। অথচ বিষয়টা এমন নয় যে ইংলন্ড বা আমেরিকার সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তাতো নয়ই, বরং প্রকৃত অবস্থা হল ঠিক বিপরীত। বিশেষত, গত এক দশক ধরে, বিশ্ব আর্থিক মহামন্দার পরবর্তী সময়ে ঐ দেশগুলির অর্থনীতি প্রবল ধাক্কা খেয়েছে। যার ফলে গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের জীবনধারনের ওপর। ফলে মানুষের ক্ষোভ সঙ্গত কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে। অক্যুপাই ওয়ালস্ট্রীট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশও ঘটছে। কিন্তু সমমাত্রার ক্ষোভের আঁচ ব্যালট বাক্সে প্রতিফলিত হচ্ছে না। নির্বাচন কেন্দ্রীক এই যে কিছুটা নিস্পৃহ মনোভাব তার প্রধান কারণই হল, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মৌলিকতো নয়ই, এমনকি বড় ধরনের কোন পরিবর্তনের আশা সে দেশেরই মানুষ করেন না। এক্ষেত্রে যেন কিছুটা নিস্পৃহ রাজনৈতিক মনোভাব কাজ করে। একমাত্র জেরেমি করবিন বা বার্নি স্যান্ডার্স-এর মতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যখন সে দেশের রাজনীতির গতানুগতিকতার খোলস ছেড়ে কিছুটা ভিন্ন সুরে কথা বলেন, কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তখন দেখা যায় সাধারণ মানুষের নিস্পৃহতায় যেন কিছুটা চিড় ধরছে। মানুষ আগ্রহভরে শুনতে চাইছেন তাঁদের কথা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের যে সহজাত প্রত্যাশা, তা সুপ্ত অবস্থা থেকে সামান্য কিছুটা হলেও জেগে ওঠে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার এই সীমাবদ্ধতা, আমাদের দেশের সংসদীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নেই। কারণ এখানে বহুদলীয় ব্যবস্থা রয়েছে। নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে বিকল্পের অভাব নেই। প্রথমাবস্থায় রাজ্যস্তরে এই বিকল্পগুলি গড়ে উঠলেও, এখন কেন্দ্রীয় স্তরেও বিভিন্ন বিকল্প মানুষের সামনে হাজির হচ্ছে। সম্ভবত এটা একটা কারণ, যার জন্য মানুষ এখনও নির্বাচন সম্পর্কে আগ্রহ হারাচ্ছেন না। এখনও সাধারণভাবে যে কোন নির্বাচনে মানুষ বিপুল সংখ্যায় ভোট দেন। তবে এটা একটা কারণ হলেও হতে পারে। কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, আমাদের সমাজে সমস্ত ধরনের বৈষম্যের মধ্যে নির্বাচন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে রাজনৈতিক সাম্যের চিত্রটি প্রতিফলিত হয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে আম্বানি, আদানি'র সাথে মহারাষ্ট্রের কৃষক লংমার্চে অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধা রমনীর অধিকার সমান। তাই নির্বাচনের সময় ঐ দরিদ্র কৃষক রমনীর মতন লাখো-কোটি মানুষকে রাজনৈতিক দলগুলির দপ্তরে নিজেদের আবেদন নিয়ে পৌঁছতে হয় না। তাঁরাই চলে আসেন ভোট প্রার্থী হয়ে মানুষের দরজায়। স্বভাবতই নির্বাচন একটা ভিন্ন বার্তা নিয়ে আসে মানুষের কাছে। বার্তাটি হল, সমাজে আপনারাও কম গুরুত্বপূর্ণ নন। আপনাদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে সরকার গঠন করা যায় না। এই উপলব্ধিই সম্ভত নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ মানুষকে প্রেরণা যোগায়।

কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণের এই উৎসাহ থাকলেও, হাতের কাছে হরেক কিসিমের বিকল্প থাকলেও, অন্তর্বস্তুগত বিকল্প কি সত্যি খুব বেশি থাকে? যে বিকল্পগুলি সাধারণ মানুষের চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে, তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ঝান্ডার রং থাকে এটা ঠিক, কিন্তু নীতি ও কর্মসূচীগত বিকল্প কি সবার কাছে থাকে? একে অপরের সমালোচনায় অনেক কথা বলেন, সেকথাগুলি হয়তো বা অনেকটাই ঠিক। কিন্তু সমাধানের প্রকৃত রাস্তা কি সবাই দেখাতে পারেন বা চান?

যেমন ধরুন, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে একটা প্রধান ইস্যু কর্মহীনতা বা বেকারি। এদেশে কর্মক্ষম যুবক-যুবতীর মধ্যে বেকারির হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত পাঁচ বছরে কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে মোদী সরকার ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু নোটবাতিলের সিদ্ধান্ত বহু কর্মরত মানুষকেও বেরোজগারির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মোদী বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলই এই ইস্যুটি নিয়ে সরব। এমনকি আমাদের রাজ্যের শাসক দলও তথাকথিত মোদী বিরোধী অবস্থান থেকে এই বিষয়ে অনেক কথা বলছে। অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই দোষে দুষ্ট এরাজ্যের শাসক দলও। অন্যান্য দলগুলিও যারা এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তারাও কেউই কর্মসংস্থানহীন বৃদ্ধির মূল কারণ নিয়ে কোনো কথা বলছে না বা বলতে চাইছে না। এই বিষয়ে একমাত্র বামপন্থী দলগুলি সমস্যার প্রকৃত কারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাইছে। প্রকৃত কারণ হলো নয়া উদারবাদী অর্থনীতি। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি ও দেশীয় কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে পরিচালিত ঐ নীতি বেকার সমস্যার মূল কারণ—এই কথা একমাত্র বামপন্থীরাই জোর গলায় বলছে এবং বলেছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল কিন্তু নয়া উদারবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। তারা কেবলমাত্র কিছু ওপর ওপর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে চাইছে। একই কথা বলা যায় কৃষক সমস্যার ক্ষেত্রে। এটিও নির্বাচনের একটি বড় ইস্যু। সারা দেশজুড়ে কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। অভাবের তাড়নায় কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। এক্ষেত্রেও কোনো রাজনৈতিক দলই বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে না পারলেও, কিছু হাল্কা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায় সারতে চাইছে। আমাদের রাজ্যের শাসক দল তো আরো এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। তারা এই রাজ্যে কৃষকের সমস্যাটাকে সরাসরি এড়িয়ে যাচ্ছে এবং মিথ্যে ভাষণে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কৃষি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়া, দেশী-বিদেশী বেসরকারী পুঁজিকে কৃষিক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ না মানা ইত্যাদি কারণেই যে কৃষিক্ষেত্রে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে সেকথা একমাত্র বামপন্থীরাই বলছে।

মোদী সরকারের পাঁচ বছরে আরও একটি বড় সমস্যা, যা নির্বাচনী প্রচারে সব দলই আনছে, তা হলো সামাজিক অস্থিরতা, ধর্মীয় বিভাজন, উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচার, দলিত ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ, মত প্রকাশের অধিকারকে খর্ব করা ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্ষেত্রেও, একেবারে ধারাবাহিক লড়াই চালিয়ে আসছে একমাত্র বামপন্থীরাই। অন্যান্য দলগুলি বহুক্ষেত্রেই দুর্বল অবস্থান গ্রহণ করে। সংখ্যাগুরু মৌলবাদের বিরোধিতায় সংখ্যালঘু মৌলবাদের তোষণ বা সংখ্যাগুরু মৌলবাদের সাথে সাময়িক আপস করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টার বহু নজির সাম্প্রতিককালেই রয়েছে। আমাদের রাজ্যের শাসকদলও এর ব্যতিক্রম নয়। একমাত্র বামপন্থীরাই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত তাৎপর্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরে। সামাজিক বিভাজনের বিরুদ্ধে এবং মত প্রকাশের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার রক্ষায় কম্বুকণ্ঠে সোচ্চার হয়।

এক কথায় প্রকৃত বিকল্পের কথা বলে বামপন্থীরাই। বহু বিকল্প মানুষের হাতের কাছে থাকলেও, সেই বিকল্প জীবন ও জীবিকার সমস্যার কোনো দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সূত্র দিতে পারে না। দিতে পারে একমাত্র বামপন্থী শক্তি। তাই বামপন্থীদের শুধুমাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় না। লড়াই করতে হয় আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি, দেশীয় কর্পোরেট পুঁজি, মিডিয়ার বিরুদ্ধেও। কারণ এরা কেউই নয়া উদারবাদের রাস্তা থেকে রাষ্ট্র সরে আসুক তা চায় না। ওরা চায়, প্রয়োজনে শাসকের পরিবর্তন হোক, দলের পরিবর্তন হোক, কিন্তু নীতি যেন অপরিবর্তনীয় থাকে। কিন্তু নীতি অপরিবর্তীত থাকলে তো সাধারণ মানুষের অন্ধকার জীবনে আলো আসবে না। তাই বামপন্থীরা লড়ে নীতি পরিবর্তনের জন্য। কোনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়, কোনো প্রসাধনী সংস্কারের জন্য নয়, বামপন্থীরা নির্বাচনে লড়ে নীতি পরিবর্তনের জন্য। এক সাথে উপরোক্ত একাধিক শত্রুর মোকাবিলা করেই এই লড়াই তাদের লড়তে হয়। এই কঠিন লড়াইয়ে তারা অবতীর্ণ হয় মানুষের সামনে প্রকৃত বিকল্প হাজির করার জন্য। নির্বাচনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য। এই কঠিন লড়াইয়ে বামপন্থীদের প্রকৃত শক্তি মানুষ। প্রচারের ধূম্রজাল ভেদ করে প্রকৃত বিকল্পের সন্ধানে পৌঁছনোর জন্য, তাই বার বার যেতে হবে মানুষের কাছে। কারণ মানুষই ইতিহাস রচনা করে। □

*২৩ মার্চ, ২০১৯*

## মাননীয়ার প্রতারণায়

*ইতোমধ্যে বহুল আলোচিত ও চর্চিত বঙ্গীয় রাজনীতির 'পরিবর্তন'-উত্তর অধ্যায়টি অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। উক্ত 'পরিবর্তন'টির যাঁহারা দৃশ্যমান কাণ্ডারী, তাঁহারা (অথবা তিনি) উপর্যুপরি দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্যপাটে আসীন হইয়াছেন। পূর্বোক্ত বাক্যটিতে ব্যবহৃত 'দৃশ্যমান' এবং বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত 'তিনি' শব্দযুগল মনোযোগী পাঠকের ভ্রূকুঞ্চনের কারণ হইতে পারে বোধ করিয়া, অতি সংক্ষেপে ইহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।*

*যাঁহারা বর্তমানে রাজ্য প্রশাসন পরিচালনা করিতেছেন, উক্ত রাজনৈতিক শক্তি, ২০১১ বর্ষের পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে বহু মত ও পথের রাজনৈতিক শক্তির একটি বিচিত্র মহাজোট গঠন করিয়া 'পরিবর্তন চাই' বলিয়া নিদান হাঁকিয়া ছিল। ঐ রামধনু মহাজোটে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নে বিভোর চরম দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও ভারতীয় জনতা পার্টির সহিত পংক্তি ভোজন সারিয়াছিল, সম্ভব হইলে আগামীকালই রাষ্ট্র বিপ্লব সম্পন্ন করিয়া ফেলিবে এমন উগ্রবাম মাওবাদী শক্তি। কোন্ যাদুবলে এমন অত্যাশ্চর্য কাণ্ডটি সম্ভব হইল, কাহার অনুপ্রেরণায় মোহন ভাগবত ও কিষেণজী সমস্বরে কোরাস গাহিতে শুরু করিলেন তাহা প্রশ্ন করিবার অবকাশ জনসাধারণ পান নাই। কিন্তু যাঁহারা তথাকথিত মহাজোটে শামিল হইয়াছিলেন (সংখ্যাটি সম্ভবত একবিংশ অথবা দ্বা-বিংশ), তাঁহারা সকলেই ছিলেন দৃশ্যমান' পরিবর্তনপন্থী।*

*রাজ্যের অর্থনীতিকে ধ্বংস করিবার জন্য, বি-শিল্পায়নের পথটিকে প্রশস্ত করিবার জন্য, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনমন ঘটাইবার জন্য উহাদের সম্মিলিত নাচন-কোদন জনগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এমনকি সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম যেরূপ 'পরিবর্তন'-এর পক্ষে জনমত গঠনে উদ্যোগী হইয়াছিল, তাহাও ছিল 'দৃশ্যমান' শক্তি। কিন্তু পর্দার অন্তরালে যাঁহারা সমগ্র চিত্রনাট্যটি রচনা করিয়াছিলেন, যাঁহাদের অঙ্গুলি হেলনে এবং 'মুদ্রা-প্রসাদ' ভক্ষণ করিবার লালসায় রামধনু জোট + বুদ্ধিজীবী + মিডিয়ার এক ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়াশীল ঘূর্ণাবত সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহারাই 'পরিবর্তন'- এর মূল কাণ্ডারী। যদিও তাঁহারা অদৃশ্য, মেঘের আড়ালে লুক্কয়িত মেঘনাদের মতন। তথাপি এই মেঘনাদ মহাকাব্যের মেঘনাদের ন্যায় কোনো একক চরিত্র নয়। পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত পরিবর্তনকামী মেঘনাদও কার্যত একটি জোট শক্তি। যে জোটে শামিল হইয়াছিল ভারতীয় কর্পোরেট পুঁজি, বৈদেশিক লগ্নীপুঁজি এবং সর্বোপরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। অদৃশ্য শক্তির শ্রেণী-আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করিবার লক্ষ্যে (বাম দুর্গটিকে দুর্বল করিবার লক্ষ্যে), তাঁহাদেরই পুঁজির স্রোতে অবগাহন করিয়া দৃশ্যমান কুশীলবগণ 'পরিবর্তন' নামক নাটকটি মঞ্চস্থ করিয়াছিলেন। যদিও সমগ্র পরিকল্পনাটিকে রূপদান করা হইয়াছিল জনস্বার্থের দোহাই পারিয়া।*

*পর্দানসীন মেঘনাদরূপী মহাজোট শক্তির পরিচালনা ও প্রযোজনায় আকস্মাৎ সমাজমুখীনতা প্রদর্শনকারী কতিপয় বুদ্ধিজীবী রচিত সংলাপ এবং মিডিয়া আরোপিত সুরে, দৃশ্যমান রামধনু জোট 'পরিবর্তন' নাটকটি অত্যন্ত সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ করিয়াছিল। কিন্তু সফল মঞ্চায়নের কিয়ৎকাল পর হইতেই, বঙ্গীয় রাজনীতি বিপরীত স্রোত প্রত্যক্ষ করিতে শুরু করিল। রামধনু মহাজোটের আকাশ হইতে একটি করিয়া তারা খসিয়া পড়িতে শুরু করিল। লালগড়ের অরণ্যে 'পরিবর্তনপন্থী' বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীর (!) নেতা কিষেণজী, কাহাকেও মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত করিবার বিপ্লবী কর্মসূচী সম্পাদন করিবার অব্যবহিত পরেই নিহত হইলেন। তাঁহার বিপ্লবী সহযোদ্ধাগণ প্রযাত নেতার অসমাপ্ত কার্যটিকে (বিপ্লব-উত্তর নূতন সমাজ গঠন) সম্পূর্ণ করিবার শপথ লইয়া দ্রুত জার্সি বদল করিয়া শাসকদলে নাম লিখাইলেন। তাঁহাদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করিয়া, অকস্মাৎ পঞ্চায়েত প্রধান হইবার বাসনার কথা সংবাদ মাধ্যম প্রবল সোরগোল তুলিয়া প্রচার করিল। যে 'মা-মাটি-মানুষ' শব্দত্রয় ছিল পরিবর্তন নাটকটির থিম সং, অচিরেই তাহা অন্তর্হিত হইল। পরিবর্তে প্রচার আকাশে অভ্যুদিত হইলো, একটি নূতন থিম—তাঁহার অনুপ্রেরণায়। জুতো সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত রাজ্য প্রশাসনের সকল কার্য সম্পাদিত হইতে শুরু করিল তাঁহার অনুপ্রেরণায়। তাঁহার অনুপ্রেরণার শক্তি এতখানি সর্বগ্রাসী যে, প্রতি বৎসর ২৫শে বৈশাখ কবিগুরুর ফটো ফ্রেমে মালা চড়াইবার কাজটিও তাঁহার অনুপ্রেরণা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। এইগুলি সবই ঘোষিত ও বিজ্ঞাপিত অনুপ্রেরণায় সম্পাদিত হয়। কিন্তু অঘোষিত অনুপ্রেরণায়ও বহু কর্ম সম্পাদিত হইয়াছে, এবং প্রতিনিয়ত হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে একটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী তাঁহার অঘোষিত অনুপ্রেরণায় বন্ধ হইয়াছে। তাঁহার পারিষদবর্গ সহাস্য বদনে নগদ অর্থমূল্যে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীন রাজ্য পুলিশ অতিশয় তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া সি বি আই আধিকারিকদের খেদাইয়া দিয়াছে এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের সহধর্মিনীর বিমানবন্দরে বামাল গ্রেপ্তারী এড়াইতে কাস্টমস অফিসারদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি তাঁহারাই অঘোষিত অনুপ্রেরণায় প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বিরোধী শক্তি বিশেষত বামপন্থীদের উপর সন্ত্রাস চলিতেছে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতেছে।*

*এইগুলি সবই ঘোষিত ও অঘোষিত অনুপ্রেরণার সুদীর্ঘ কিন্তু অসম্পূর্ণ তালিকা। আরও বহু বিষয় রহিয়াছে যাহা স্থানাভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হইলো না। অনুপ্রেরণার পাশাপাশি, প্রতারণার তালিকাটিও দীর্ঘ। যেমন, তাঁহারাই প্রতারণায় এই বঙ্গের শতাধিক কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাইয়া আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছে। কর্মহীন যুবক যুবতীগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ মরীচিকার ন্যায় ক্রমশ অপসৃত হইয়াছে। প্রতি বৎসর সমারোহ করিয়া শিল্প সম্মেলন হইয়াছে, কিন্তু নূতন শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। একাধিক শিল্প সংস্থা বন্ধ হইবার ফলে কর্মরত শ্রমিকরা কাজ হারাইয়াছেন। তাঁহারাই প্রতারণায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও শিক্ষক হইবার স্বপ্ন পূরণ হয় নাই। তাঁহারই প্রতারণায় রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকগণের মহার্ঘভাতা বকেয়া পড়িয়াছে, বেতন কমিশন তিন বৎসর অতিক্রম করিবার পরেও দিনের আলো চাক্ষুষ করে নাই। চা বাগান ও চট শিল্পের শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি মেলে নাই। নারীদের সম্ভ্রম বে-আব্রু হইয়াছে।*

*এহেন প্রতারণার তালিকা সরকারী বিজ্ঞাপনে খুব স্বাভাবিকভাবেই দৃশ্যমান হইবে না। কিন্তু রাজ্যবাসীর মনোজগতে প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান হইতেছে। স্বভাবতই নিশ্চিতভাবে যাহার প্রতিক্রিয়ামূলক বহিঃপ্রকাশ অচিরেই ঘটিবে।* □

*৮ই চৈত্র, ১৪২৫*

**মার্চ-এপ্রিল, ২০১৯ মাসব্যাপী সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার ২০১৯-২০ গ্রাহকবর্ষের গ্রাহক সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য জেলা / অঞ্চল / সমিতিগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে।**

**কেন্দ্রীয় কমিটি**

## আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে

# মেহনতীদের বিকল্প নীতির দাবিসনদ

**আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 'মিডিয়া' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই প্রশ্ন হাজির করছে। তা হল আগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নেতার বদল হবে কিনা। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি-ই আবার ক্ষমতায় আসবে। না কি অন্য কোনে দল বা জোট। অন্য কেউ এলে, তার নেতা বা নেত্রী কে হবেন ইত্যাদি।**

**মিডিয়া খুবই পরিকল্পিত উপায়ে এই আলোচনার অবতারণা করছে। কারণ তারা জানে বিভিন্ন কারণে গত পাঁচ বছরে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বেড়েছে। যা অনেকটাই বোঝা গেল উপর্যুপরি কৃষক আন্দোলন, ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯-র সাধারণ ধর্মঘট এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলে। তাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, যে মোদীজির গদী টালমল করছে। কাশ্মীরের পুলওয়ামার ঘটনা ও তার পরবর্তী রেশ নিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচার করেও এই ধাক্কা সামলানো যাবে না। তাই কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত মিডিয়ার নব কৌশল হল, একান্তই যদি নেতা বা দলের পরিবর্তন হয় হোক। কিন্তু আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি ও কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে পরিচালিত নয়া উদারবাদী নীতির যেন কোন পরিবর্তন না ঘটে। খেটে খাওয়া মানুষকে শোষণ করে মুনাফার পাহাড় জমানোর কাজটা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।**

**কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ জানে শুধু নেতার পরিবর্তন নয়, নীতিরও পরিবর্তন করতে হবে। সংসদে রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্যকে এমন শক্তির অনুকূলে আনতে হবে, যাঁরা খেটে মানুষের স্বার্থে কথা বলবেন। জনস্বার্থবাহী নীতি প্রণয়নে সরকারকে বাধ্য করবে। এই বিকল্প জনস্বার্থবাহী নীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি দাবিসনদ প্রস্তুত করা হয়েছে। গত ৫ মার্চ নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি কনভেনশন থেকে এই দাবিসমূহ চূড়ান্ত করা হয়। সিআইটিইউ সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং শ্রমিক কর্মচারীদের জাতীয় ফেডারেশনগুলি যৌথভাবে এই দাবিসনদ গ্রহণ করে। ৩১ দফা দাবি সম্বলিত এই সনদে শ্রমজীবী মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে।**

১। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যসমূহের আকাশছোঁয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যসমূহের ফাটকাবাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে হবে; গণবণ্টন ব্যবস্থাকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে হবে; গণবণ্টন ব্যবস্থার পরিষেবা পেতে আধার সংযুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক করা যাবে না।

২। শ্রমনিবিড় সংস্থাসমূহকে উৎসাহ দেবার নীতির মধ্য দিয়ে বেকারত্বকে রোধ করতে হবে; নিয়োগকারী বা মালিকশ্রেণিকে প্রদেয় আর্থিক সাহায্যকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে যুক্ত করতে হবে; সরকারী দপ্তরসমূহে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে; সরকারী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা এবং বাৎসরিক ৩ শতাংশ সরকারী পদ অবলুপ্তি প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

৩। স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী চরিত্রের কাজে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং আউটসোর্সিং আটকাতে হবে।

৪। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী স্থায়ীশ্রমিকদের সমগোত্রীয় কাজে নিয়োজিত চুক্তিশ্রমিকদের স্থায়ীশ্রমিকের সমতুল সুবিধাসমূহ ও সম মজুরি প্রদান কঠোরভাবে রূপায়িত করা হোক।

৫। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সমকাজে পুরুষ ও মহিলার সম মজুরির নীতি কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে।

৬। পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সুপারিশসমূহ এবং সুপ্রিম কোর্টে যা পটাকোশ অ্যান্ড ব্রেট মামলার রায় মোতাবেক জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।

৭। ন্যূনতম পেনশন প্রতিমাসে ৬ হাজার টাকা এবং সর্বজনীন পেনশন সুনিশ্চিত করতে হবে।

৮। অঙ্গনওয়াড়ি শ্রমিক ও সহায়িকা, আশা এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে কর্মরত অন্যান্যরা, মিড-ডে-মিল শ্রমিকরা, প্যারাটিচার, জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রোজেক্টে কর্মরত শিক্ষক ও অশিক্ষক সহ বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পে কর্মরতের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, ন্যূনতম মজুরি প্রদান, সকলকে পেনশন সহ অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।

৯। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও)-র ২০৪ নম্বর সুপারিশের মর্মবস্তু-লঙ্ঘনকারী 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট' বাতিল করতে হবে। ভারত আই এল ও-র ওই সুপারিশের সমর্থনকারী দেশ।

১০। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ বন্ধ হোক।

১১। রেল, প্রতিরক্ষা, বন্দর, ব্যাঙ্ক, বীমা, কয়লাখনি প্রভৃতি বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করো। কয়লাখনিগুলির বাণিজ্যিকভাবে খননের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করো।

১২। সপ্তম পে- কমিশনের কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কিত বিষয়সমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি।

১৩। নয়া-পেনশন প্রকল্প বাতিল এবং পুরাতন পেনশন প্রকল্প পুনর্বহাল হোক।

১৪। শ্রমআইনসমূহে মালিকমুখী ও শ্রমিকবিরোধী সংশোধন বন্ধ হোক। চালু শ্রম আইনসমূহের কঠোরভাবে প্রয়োগ সুনিশ্চিত হোক।

১৫। মহিলা শ্রমিকদের সবেতন ২৬ সপ্তাহ প্রসবকালীন ছুটি, প্রসবকালীন সুবিধাসমূহ প্রদান এবং ক্রেসের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উপর যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইনের কঠোরভাবে প্রয়োগ।

১৭। যৌথ দর-কষাকষির অধিকার এবং ইউনিয়ন গড়ার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আইএলও-র ৮৭ ও ৯৮ নম্বর কনভেনশন সহ গৃহস্থলি শ্রমিকদের প্রসঙ্গে আইপিএলও-র ১৮৯ নম্বর কনভেনশনের অনুমোদন।

১৮। দ্বি-পাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করো; শ্রম-সম্পর্কিত যে-কোনো বিষয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সহমতে পৌছানো ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না।

১৯। কর্পোরেটদের ভরতুকি প্রদান ছাঁটাই করা হোক।

২০। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মতো ন্যূনতম সহায়কমূল্য নির্ধারণ হোক।

২১। কৃষকদের ঋণ মকুব।

২২। কৃষি মজুরদের কাজের শর্তাবলী ও সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে সুসংহত আইন প্রণয়ন।

২৩। এম জি এন রেগায় বছরে ২০০ দিন কাজ দিতে হবে। শহরাঞ্চলকে এই প্রকল্পের আওতায় আনতে একই ধরনের আইন চালু করতে হবে। এই প্রকল্পে ন্যূনতম মজুরি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির কম যেন না হয়।

২৪। সংবিধান ৫১ এ ধারায় সকল নাগরিকের প্রতি সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, বৈচিত্রাবলীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে; ধর্মীয়, ভাষাগত, অঞ্চলগত এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিকে তুলে ধরার এবং মহিলাদের মর্যাদাহানিকর নীতি সমূহের নিন্দা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সংবিধানের এই ধারা যাতে যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

২৫। যারা অসবর্ণ বিবাহ করেছেন, এরকম দম্পতিদের সুরক্ষা দিতে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২৬। ধর্ষণ ও মহিলাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য হিংসার মামলায় আসামীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে।

২৭। এসসি/এসটি প্রিভেনশন অব অ্যাট্রোসিটিজ অ্যাক্ট-এর কঠোর রূপায়ণ।

২৮। এস সি/এস টি সংরক্ষিত সমস্ত পদ পূরণ সুনিশ্চিত করা।

২৯। কারিগরি শিক্ষা সহ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত পড়ুয়ার অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩০। সার্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করা। স্বাস্থ্যখাতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করে জিডিপি-র ৫ শতাংশে উন্নীত করা।

৩১। সংবিধান সংশোধন করে কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। □

# ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংকট

২০১৮ সালে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে ২১টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সর্বমোট লোকসানের পরিমাণ ৮৫ হাজার কোটি টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত ব্যাঙ্কিং শিল্পের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১১-১২ সালে সমগ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের বৃদ্ধির হার ছিল ১৮ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ সালে কমতে কমতে এসে দাঁড়ায় ৫ শতাংশে। ২০১৭-১৮ সালে তা কিছুটা বেড়ে ১০ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক এই বৃদ্ধির পিছনে মূল ভূমিকা রয়েছে বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির। কারণ গত তিন বছরে এদের বার্ষিক ঋণ বৃদ্ধির হার গড়ে ২০ শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ঐ সময়ে গড়ে ৪ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায় পণ্য ও পরিষেবার বাজারে বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অথচ এই সময়কালে কিন্তু মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন সাপেক্ষে, মোট ঋণের অনুপাতে তেমন কোন তারতম্য ঘটেনি। ২০১৪ সালের মার্চে এই অনুপাত ছিল ৫৩.৪ শতাংশ, ২০১৮ সালের মার্চে যা কমে হয়েছে ৫১.৪ শতাংশ। ইউপি এ-২ সরকারের আমলে জি ডি পি সাপেক্ষে নতুন ঋণ প্রদানের গড় অনুপাত ছিল বার্ষিক ৮ শতাংশ। মোদী সরকারের আমলে এই গড় অনুপাত কমে হয়েছে ৫ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের শুরুতে এই অনুপাত আরও নিম্নগামী। এর থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়, লোকসানের কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণ প্রদান করার ক্ষমতা যেমন কমেছে, তেমনি বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি আগের থেকে বেশী ঋণ দিয়েও, সেই জায়গা ভরাট করতে পারেনি। এমনকি এখনও সমগ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে বাজারে যত ঋণের যোগান দেওয়া হয়, তার ৬৩ শতাংশই আসে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংকটের আরও একটা বড় কারণ অনাদায়ী ঋণ। ইউপিএ-২ সরকারের আমলে আনাদায়ী ঋণের পরিমান ছিল ৫.৭ লক্ষ কোটি টাকা। মোদী জমানায় এর পরিমান ১৬.৭ লক্ষ কোটি টাকা। ইউপিএ-২ সরকারের আমলে মোট ঋণ মকুব করা হয়েছিল ৫৫ হাজার কোটি টাকা। মোদী সরকারের আমলে মোট মকুব করা ঋণের পরিমান ৪ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণ মকুবের পরিমাণ ৩.২ লক্ষ কোটি টাকা।

ঋণ মকুবের পাশাপাশি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির কারণেও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির স্বাস্থ্য রুগ্ন হয়ে পড়ছে। ২০১৬-১৭ সালে ব্যাঙ্ক থেকে লুট হওয়া মোট অর্থের পরিমান ছিল ২৪ হাজার কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ হাজার কোটি টাকা। মোদী সরকারের আমলে এ পর্যন্ত লুট হওয়া মোট অর্থের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৩ হাজার কোটি টাকা। অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্য প্রণীত 'ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপসি কোড'-কে মোদী সরকার নিজেদের সাফল্য বলে প্রচার করেছে। কিন্তু এই নতুন বিধি প্রয়োগের ফল এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই আইনের আওতায় গঠিত জাতীয় কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল ৫০টি মামলার নিষ্পত্তি করতে পেরেছে এবং এর মধ্য দিয়ে অনাদায়ী ঋণের মাত্র ৪৫ শতাংশ আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২১টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে ১১টিকে 'প্রম্পট কারেকটিভ অ্যাকশন'-এর অন্তর্গত করেছে। এর ফলে এই ব্যাঙ্কগুলির ঋণ প্রদানের ক্ষমতা, শাখার সংখ্যাবৃদ্ধি বা কর্মী নিয়োগ আপাতত নিষেধাজ্ঞার আওতায়। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই 'রিপোর্ট অন ট্রেন্ড এন্ড প্রোগ্রেস অফ ব্যাঙ্কিং প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ঐ আইনের আওতায় এলেও ব্যাঙ্কগুলির স্বাস্থ্য ফেরেনি। ২০১৭-১৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে ৯০ হাজার কোটি টাকার পুঁজি বিনিয়োগ করে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আরও ৫১ হাজার কোটি পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়। এতদসত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পুঁজি ও সম্পদের অনুপাত (ক্যাপিটাল অ্যাডিকুয়েসি রেশিও) ২০১৭ সালের মার্চে ছিল ১২.১ শতাংশ। ২০১৮ সালের মার্চে তা কমে হয়েছে ১১.৩ শতাংশ। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কে জনগণের করের টাকায় যতনা পুঁজি ঢেলেছে, তার থেকে অসৎ পুঁজিপতিদের অনেক বেশি পরিমাণ ঋণ মকুব করে দিয়েছে। আমাদের দেশের চৌকিদার প্রধানমন্ত্রীর আমলে আম্বানি-আদানির ঋণ মকুব করে, জনগণের করের টাকায় লোকসানে চলা ব্যাঙ্কগুলিকে 'বেইল আউট' করার চেষ্টা করা হচ্ছে। 'বেইল আউটের পাশাপাশি এফ আর ডি আই আইনের মাধ্যমে লোকসানে চলা ব্যাঙ্কগুলির ব্যবসাগুটিয়ে জনগণের সঞ্চিত অর্থ লোপাট করে দেওয়ার 'বেইল ইন' পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই, বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলগুলির যৌথ প্রতিবাদের মুখে সরকার পিছু হটেছে। কিন্তু মোদী সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এলে এফ আর ডি আই কার্যকরী করতে উঠে পড়ে লাগবে। তাই ব্যাঙ্ক শিল্পকে বাঁচাতে সরকার পরিবর্তন জরুরী। □

# প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা : প্রচার ও বাস্তবতা

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা 'ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পগুলিকে ঘিরে এমনভাবে প্রচার করা হয়েছিল, যাতে প্রাথমিকভাবে আমজনতার মনে হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী বোধহয় অভিনব কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি অদৌ তা নয়। কারণ বর্তমান প্রকল্পের আগেও ভারত সরকারের কৃষি বিমা প্রকল্প ছিল। ২০১৪-১৫ সালে সেই প্রকল্পের নাম ছিল ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ইন্সুরেন্স স্কিম এবং ২০১৫-১৬ সালে নাম হয় 'মডিফায়েড ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ইন্সুরেন্স স্কীম।' আর টি আই দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান প্রকল্প চালু হবার পর বিমা কোম্পানিগুলির (অধিকাংশই বেসরকারী) আদায় কৃত প্রিমিয়ামের টাকার পরিমান ৩৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বিমাকৃত কৃষকের সংখ্যা কমে গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান প্রকল্প ঘোষণা হওয়ার আগে পূর্বতন বিমা প্রকল্পে (২০১৫-১৬) বিমা ক্রয় করেছিলেন ৪৮ কোটি ৫৫ লক্ষ কৃষক। প্রকল্প ঘোষণা হওয়ার বছরে (২০১৬-১৭) নতুন বিমা ক্রয় করেন ৫৭ কোটি কৃষক। কিন্তু দ্বিতীয় বছরেই (২০১৭-১৮) এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪৮ কোটি ৭৬ লক্ষে। একবছরে হ্রাস পায় ১৪ শতাংশ। এই একবছরে যে ৮৪ লক্ষ কৃষক প্রকল্পটি ত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিজেপি শাসিত চারটি রাজ্যের (মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ) কৃষকের সংখ্যা ছিল ৬৮ লক্ষ ৩১ হাজার।

প্রকল্প ঘোষণা করার সময় প্রধানমন্ত্রীর দাবি ছিল, ২০১৮-১৯ সালের মধ্যে ১০ কোটি হেক্টর কৃষি জমি বীমার আওতায় আসবে। কিন্তু বাস্তবে এখন পর্যন্ত বীমার আওতায় আসা ৪.৯ কোটি হেক্টর কৃষি জমির পরিমানও কমবে। একদিকে বিমাকৃত কৃষকের সংখ্যা কমছে, বিমার আওতায় থাকা জমির পরিমাণ বাড়েনি কিন্তু কোম্পানিগুলির প্রিমিয়াম বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমান বেড়েছে। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে বৃদ্ধির হার ৩২ শতাংশ। মোট পরিমান দাঁড়িয়েছে ২৫,০৪৬ কোটি টাকা। বিপরীতে কমে গেছে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক। নরেন্দ্র মোদী ঘোষিত নয়া প্রকল্পের আগের প্রকল্পে, দু'বছরে প্রিমিয়াম বাবদ আদায় হয়েছিল ১০,৫৬০ কোটি টাকা। আর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল ২৮,৫৬৪ কোটি টাকার। অর্থাৎ প্রিমিয়ামের তুলনায় ক্ষতি পূরণের অংক বেশী। কিন্তু বর্তমান প্রকল্পে দু'বছরে প্রিমিয়াম বাবদ বীমা কোম্পানিগুলি আয় করেছে ৪৭,৪০৮ কোটি টাকা। আর ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় টাকার পরিমাণ ৩১,৬১৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ বীমা কোম্পানিগুলির হাতে উদ্বৃত্ত থাকছে ১৫,৭৯৫ কোটি টাকা। এর সম্পূর্ণটা না হলেও একটা বড় অংশই লাভ।

কিভাবে বীমা কোম্পানিগুলি লাভ করছে। মহারাষ্ট্রের একটি জেলায় তার সমীক্ষা করেছিলেন সাংবাদিক পি সাইনাথ। ২.৮০ লক্ষ কৃষক প্রিমিয়াম বাবদ রিলায়েন্স কোম্পানিকে দিয়েছিল ১৯.২ কোটি টাকা। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার মিলে দিয়েছিল ১৫৪ কোটি টাকা। প্রিমিয়াম বাবদ রিলায়েন্স পেয়েছিল মোট ১৭৩.২ কোটি টাকা। রিলায়েন্স ক্ষতিপূরণ বাবদ কৃষকদের দিয়েছিল ৩০ কোটি টাকা। অর্থাৎ কোন বিনিয়োগ ছাড়াই রিলায়েন্স লাভ করল ১৪৩ কোটি টাকা।

কৃষি বীমা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষকরা এই প্রকল্প থেকে বেড়িয়ে আসতে চাইছে, তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। কারণগুলি হল— (১) প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোন কারণে ফসলের ক্ষতি হলে, বীমার টাকা পেতে বছর ঘুরে যাচ্ছে। ফলে পরের মরশুমে কৃষক চাষ করতে পারছেন না। (২) ফসলের ক্ষতির পরিমান নিরুপণ করার পদ্ধতিটিও ত্রুটিপূর্ণ। সাধারণ বিমার ক্ষেত্রে যেমন যে সম্পত্তিটির ক্ষতি হচ্ছে। তার ক্ষতির অঙ্ক নিরুপণ করা হয়। কিন্তু ফসলবীমায় সমগ্র পঞ্চায়েতকে ইউনিট ধরে গড় ক্ষতির অঙ্ক নিরুপণ করা হয়। (৩) বিমা কোম্পানিগুলি ফসলের মোট মূল্যের বিমা না করে, একটি নির্দিষ্ট অংশের বিমা করছে। (৪) প্রিমিয়ামের টাকা সরকারকে দিতে হলেও, তার পরিমান নির্ধারণ করছে কোম্পানিগুলি। সরকারের কোন ভূমিকা নেই।

স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রীর ফসল বিমা যোজনায় কৃষকের আখেরে কোন লাভ হচ্ছে না। □

# কর্মসংস্থানের ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি

সি পি চন্দ্রশেখর

২০১৯ এর নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে কৃষি সংকটে জর্জরিত নরেন্দ্র মোদী সরকারের সামনে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দূরবস্থা সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ আরেক বিপদ হাজির করেছে। মনে রাখতে হবে, ২০১৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরে আসার আগে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স প্রতি বছর ২ কোটি কাজ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

কর্মসংস্থান সম্পর্কে বর্তমানে সবচেয়ে ভাল যে তথ্যসূত্র আমরা পেয়েছি, তা হল ' সেন্টার ফর মনিটরিং দ্য ইন্ডিয়ান ইকনমি'র করা বেসরাকারী (এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল) একটি পারিবারিক নমুনা সমীক্ষা— কনজিউমার্স পিরামিডস হাউস হোল্ড সার্ভে। ২০১৬ সালে ১,৭০,০০০ নমুনার ওপর এই সমীক্ষা হয়েছিল। জানুয়ারি—এপ্রিল চারমাস ব্যাপী সমীক্ষার কমবেশি সমধর্মী নমুনা গুচ্ছের ওপরই সারা বছর ধরে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। দেখা গেল, সাক্ষাৎকারের দিন সাক্ষাৎকারীর অবস্থান অনুযায়ী কর্মনিযুক্তদের সংখ্যা জানুয়ারি—এপ্রিল ২০১৬ তে যেখানে ছিল ৪০ কোটি ১০ লক্ষ, মে—আগস্ট, ২০১৬ তে সেটা বেড়ে দাঁড়াল ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ এবং জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৭ তে ৪০ কোটি ৫০ লক্ষতে নেমে আসার আগে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৬ তে তা হয়েছিল ৪০ কোটি ৬৫ লক্ষ। এটা বিমুদ্রাকরণের পরিণতিতে হয়েছিল বলে বিতর্ক উঠছে। মূলত এর দ্বারা বোঝা যায়, ২০১৬ সালের প্রথম ও শেষ ত্রৈমাসিক পর্বের মধ্যবর্তী সময়ে কর্মসংস্থান যেখানে বেড়েছিল ৫৫ লক্ষ, বিমুদ্রাকরণের ফলশ্রুতিতে এই সংখ্যা বার্ষিক ৪০ লক্ষে নেমে আসে। এমনকি যখন আমরা সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির সঙ্ঘে প্রবেশ করেছি বলে দাবি করা হচ্ছে, তখন মোদী সরকার কর্মসংস্থানের লক্ষ্যপূরণে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে।

এছাড়া আরও সম্প্রতি সি এম আই ই-র যেসব পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে এসেছে তাতে অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কর্মরতদের সংখ্যা এপ্রিল—জুন ২০১৭ (বা ২০১৭-১৮ বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক)-এ ছিল আনুমানিক ৪০ কোটি ৬০ লক্ষ। ২০১৮-১৯ বর্ষের প্রথম তিনমাসে তা নেমে এসেছে ৪০ কোটি ২০ লক্ষতে। এটা বোঝাচ্ছে, বিমুদ্রাকরণের পর যে কর্মসংস্থান হ্রাস হওয়া শুরু হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত। ডিসেম্বর, ২০১৮ তে সংগৃহীত মাসিক নমুনার ভিত্তিতে ওই পরিসংখ্যান আরও কম, আনুমানিক ৩৯ কোটি ৯৭ লক্ষ।

'কর্মসংস্থানহীন' বৃদ্ধির ঘটনা শুধুমাত্র ভারতেই ঘটেছে এমন নয়। কিন্তু এই দেশের ক্ষেত্রে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এখানকার তরুণ প্রজন্মের জন্য। ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের ১২৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৪২ কোটি ২০ লক্ষ ১৫—২৯ বছর বয়সসীমার মধ্যে পড়ে। এছাড়াও, প্রতিবছর ১ কোটি ৩০ লক্ষ তরুণ-তরুণী কাজের বাজারে ঢুকছে। জনসমূহগত এই প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। ২০১১ থেকে ২০১৫ সালে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৫-২৯ বছর বয়স্কদের সংখ্যা ৪ কোটি বেড়েছিল, কিন্তু ২৯ বছরের বেশি বয়স্কদের সংখ্যা ৩ কোটি কমে গিয়েছিল।

আজিম উসমানি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর সাস্‌টেইনেবেল এমপ্রয়মেন্ট'-এর 'কর্মরত ভারতের অবস্থা' শীর্ষক সামগ্রিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ''বেকারদের মধ্যে অনুপাতের হারে অস্বাভাবিকভাবে তরুণ-তরুণীরা বেশি। ৬০ শতাংশ বেকার ১৫-২৫ বছর বয়স্কদের গ্রুপের অন্তর্গত। যদিও এই গ্রুপ কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যার মাত্র ৩০ শতাংশ। বেকার বোঝাতে এখানে যে মুখ্য অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করা হয়েছে তা হল যারা কাজ খুঁজছেন এবং এক বছরের মধ্যে অন্তত ছমাসের কাজও যারা যোগার করতে পারেননি, তাদের ধরা হয়েছে। শিক্ষিতদের মধ্যেও বেকারীর হার অস্বাভাবিক বেশি। এক বছর ধরে ক্রমাগত কাজ খুঁজে যারা দু'মাসের কম সময়ের জন্য কাজ পেয়েছেন এমন ২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ স্নাতক বা তার থেকেও উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন।

সম্প্রতি সরকারী পরিসংখ্যানের সঙ্গে সি এস আই ই-র পরিসংখ্যানগুলির তুলনা বিচার অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ আগে পরিসংখ্যানগত যে সমীক্ষাগুলি করা হত এবং যেগুলি কর্মসংস্থানের প্রবণতাকে মাপার জন্য খুবই নির্ভর যোগ্য ছিল, সেগুলি আপাতত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আগে দশ বছর মেয়াদি আদমশুমারি ছাড়াও পাঁচ বছর মেয়াদের বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সমীক্ষা জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে হত। ২০১১-১২ সালে ঐ সমীক্ষা শেষবার হয়েছিল তারপর সরকার এটি বন্ধ করে দেয়। যুক্তি দেখানো হয় যে নীতি নির্ধারণের জন্য দ্রুত হারে তথ্য সংগ্রহ এবং পৌছান প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্য সেটা ছিল বলে মনে হয় না।

প্রথম যে এজেন্সিকে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের অন্তরে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় সেটি হল লেবার ব্যুরো। 'কর্মসংস্থান বৃদ্ধি'র দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আটটি নির্বাচিত অ-কৃষি ক্ষেত্রের উদ্যোগুলি এর মধ্যে ছিল। সমীক্ষাটি শুরু হয়েছিল ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে। যার প্রথম ফলাফল পাওয়া যায় এপ্রিল-২০১৬ তে। এইরকম ত্রৈমাসিক সমীক্ষা যতবার করা হয়েছিল, তার শেষ দফার ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল অক্টোবর, ২০১৭ তে। তারপর থেকেই এই সমীক্ষা বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু যে তথ্য পাওয়া গেছিল তা সরকারের পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাতে দেখা গেছিল এই আটটি সেক্টরে কর্মসংস্থান এপ্রিল, ২০১৭ র পূর্ববর্তী এক বছরে বেড়েছে ৪ লক্ষ ১৬ হাজার এবং অক্টোবর, ২০১৭-র পূর্ববর্তী এক বছরে বেড়েছে ৫ লক্ষ ৭ হাজার।

### লেবার ব্যুরোর তথ্য

লেবার ব্যুরোও ২০১৩-১৪ সাল থেকে বার্ষিক পারিবারিক সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে যাতে কম সময়ের ব্যবধানে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেওয়া যায়। বার্ষিক পরিবার ভিত্তিক সমীক্ষাগুলিকে বিবেচনায় আনলে মোট কর্মসংস্থান (একটি সাধারণ মুখ্য অবস্থানগত ভিত্তিতে) ২০১৩-১৪ সাল থেকে ২০১৫-১৬ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে ১৫ বছর এবং তার বেশি বয়সের গ্রুপের ক্ষেত্রে কমে গিয়েছিল ৩৭ লক্ষ ৪০ হাজার। এই বার্ষিক সমীক্ষা নির্ভুল এবং যথাযথ হলে কর্মসংস্থান হ্রাস শুধু কৃষি ক্ষেত্রে (বিশেষভাবে মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে) ঘটে নি, বরং শহরাঞ্চলে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং নির্মাণ শিল্পে কর্মরত পুরুষদের মধ্যেও ঘটেছিল। যে সেক্টরগুলিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছিল তা হল খুচরো এবং পাইকারী ব্যবসা। যে দেশে সামাজিক সুরক্ষা খুবই সীমিত সেখানে বেকাররা নীচের স্তরের এই ক্ষেত্রগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছে। এই বার্ষিক সমীক্ষাটিও বন্ধ রাখা হয়েছে। জানা যাচ্ছে যে ২০১৬-১৭ সালে সমীক্ষা হয়েছে কিন্তু তার ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। এরমধ্যেই, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থাকে মরশুমী শ্রম শক্তি সংক্রান্ত সমীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ এবং কর্মসংস্থানের আনুমানিক বার্ষিক হিসাব তৈরীর জন্য। প্রথম এইরকম একটি সমীক্ষা এপ্রিল, ২০১৬ তে সূচনা হয়েছিল বলে জানা যায়। মজার বিষয় হল ঐ প্রয়াসের কোনো ফলাফল এতদিনে পাওয়া যায়নি।

উদ্বেগের বিষয় হল যখন এই সমীক্ষাগুলো বন্ধ করে রাখা হচ্ছে বা দেরি করে তাদের ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে, তখন প্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির নির্দেশক হিসাবে যে পরিসংখ্যানগুলিকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেগুলি আদৌ যথাযথ এবং নির্ভরযোগ্য নয়। এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কোনো নিয়মমাফিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, বীমা বা পেনশন স্কীমে নথিভুক্ত হয়েছেন, তাঁকেই প্রথাগত শ্রমিকের সংজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থা (ই পি এফ ও), কর্মচারী রাজ্য বীমা কর্পোরেশন, এবং পেনশন রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (পি এফ আর ডি এ)-র রেজিস্ট্রেশনের তথ্য থেকে প্রথাগত শ্রমিকদের সম্বন্ধে একগুচ্ছ পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

এই পরিসংখ্যানগুলি যখন প্রথমদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনুমিত হিসাব তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন দাবি করা হয়েছিল, সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮ এই ছ'মাসে ৩৫ লক্ষ প্রথাগত কর্মসংস্থান হয়েছে। এর পাশাপাশি লেবার ব্যুরোর ৬ষ্ঠ ও ৭ম ত্রৈমাসিক সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছিল এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তে ২ লক্ষ কাজ সৃষ্টি হয়েছে।

ই পি এফ ও-র পরিসংখ্যানে এটাও দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৭ সালে প্রথাগত শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ লক্ষ বেড়েছে। এই সংখ্যা শ্রমশক্তিতে নতুন যুক্ত হওয়া শ্রমিকদের ১/৩ থেকে ২/৩ অংশ (নতুন শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণের পদ্ধতি অনুযায়ী)। এই পরিমাণ উন্নতমানের কাজ সত্যিই

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

## প্রসঙ্গ ঃ কর্মসংস্থান

# বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল ?

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের আগে, শ্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দল, সমর্থন আদায়ের জন্য জনগণের সামনে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল, বছরে দু'কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ হলে, গত পাঁচ বছরে মোটামুটি ১০ কোটি কর্মহীন যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে কি হয়েছে? বাস্তবে কর্মহীনতা তথা বেকারীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার এই বিষয়ে সমীক্ষা লব্ধ যে ফলাফল, তা প্রকাশে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই বাধা দিচ্ছে। কারণ সমীক্ষালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করলেই, কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা ধরা পড়ে যাবে।

কিন্তু তথ্য ও পরিসংখ্যানকে ধামাচাপা দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করার শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইতোমধ্যে বিভিন্ন বেসরকারী সূত্র মারফৎ ফাঁস হয়ে যাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, কর্মহীনতার হার বর্তমানে গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যথারীতি ফাঁস হয়ে যাওয়া তথ্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি এই বিষয়ে সরকারের সাথে বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থার টানাপোড়েনের কারণেই ন্যাশনাল স্ট্যাটিসস্টিকাল কমিশনের দু'জন উচ্চপর্যায়ের আধিকারিক পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু এর পরেও সত্যকে আড়াল করা যাচ্ছে না। কারণ সরকার পোষিত বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষা প্রতিবেদনই সমধর্মী চিত্র তুলে ধরেছে। যেমন 'সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি'র প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র ২০১৮ সালেই ভারতে ১ কোটি ১০ লক্ষ কাজের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। দ্য অল ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারারস্ অর্গানাইজেশন- এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ২০১৬ থেকে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রেই ৩৫ লক্ষ কাজের সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। এই হ্রাস প্রাপ্তির কারণ হিসেবে তারা দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছে— (১) নোটবন্দী ও (২) পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি)।

সম্প্রতি (জুলাই ২০১৮) অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (এ আই টি ইউ সি) তাদের নিজস্ব উদ্যোগে সংগঠিত একটি সমীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে। যেখানে বলা হয়েছে, ''ভারতে মোট ক্ষুদ্র ব্যবসার সংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লক্ষ। এর এক পঞ্চমাংশ ভারতীয় অর্থনীতিতে যার অবদান প্রায় ৩২ শতাংশ এবং প্রায় ১১ কোটি ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানকে ধারণ করে সেখানে জিএসটি-র ধাক্কায় লাভের অংক ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে ফাঁস হয়ে যাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, শহরে বসবাসকারী নারীদের মধ্যে কর্মহীনতার হার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭.২ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বারবার মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধির ঢাক পেটানো হলেও, উচ্চ জিডিপি বৃদ্ধির হার, উচ্চ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারে রূপান্তরিত হচ্ছে না। অর্থাৎ কর্মসংস্থানহীন বৃদ্ধি ঘটছে। সম্প্রতি 'ইউনিসেফ' ও 'জাস্ট জব নেটওয়ার্ক' নামক একটি সংস্থার যৌথ সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে। ১৮-২৯ বছর বয়সের স্নাতকস্তর উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীদের মধ্যে ১৮ শতাংশ বেকার। স্নাতকস্তর উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীদের ৫৮ শতাংশ জানিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছেন না। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের এই হতাশার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলিও দায়ী।

উড়িষ্যায় বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে ১.৫ লক্ষ পদ শূন্য রয়েছে, যা পূরণ করার কোন উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করছে না। আশ্চর্যের বিষয় হল, সরকারী পদগুলিকে শূন্য রেখে, বিপুল প্রচারের সাহায্যে 'বিজু যুব বাহিনী' নামক একটি প্রকল্পে, বাৎসরিক ১.৫ লক্ষ টাকা ভাতার বিনিময়ে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ৭৫২০ টি 'বিজু যুব বাহিনী'তে প্রায় তিন লক্ষ যুবক-যুবতীকে যুক্ত করা হয়েছে। অথচ 'সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০১৭-১৮ সালে ঐ রাজ্যে কর্মহীনতার হার ছিল ৬.৬ শতাংশ, কিন্তু ১৫-২৯ বছর বয়সসীমার মধ্যে ঐ হার ১৫ শতাংশ। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় অংশের ক্ষেত্রেই উড়িষ্যায় বেকারীর হার সর্বভারতীয় গড় হারের থেকে বেশী।

পশ্চিমবাংলার চিত্রও আলাদা কিছু নয়। এই রাজ্যে যতটুকু কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, তা হচ্ছে বেসরকারী ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্র সাধারণভাবে শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রে। কিন্তু এ রাজ্যে ম্যানু ফ্যাকচারিং ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হচ্ছে (উদাহরণ সিঙ্গুরে মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প এবং শালবনীর ইস্পাত শিল্প) নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হারেও। উড়িষ্যার মতই পশ্চিমবাংলাতেও লক্ষাধিক সরকারী পদ শূন্য, যেখানে স্থায়ী নিয়োগের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। ফলে শিক্ষিত ও দক্ষ যুবক-যুবতীদের কাজের সুযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কখনও তেলেভাজা বিক্রী করে (প্রধানমন্ত্রী বলেছেন পকোড়া বিক্রী করতে) রোজগার করার কথা বলছেন, কখনও বলছেন ৮০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতই পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তথ্য গোপন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ২০১৫-১৬ সালের পঞ্চম এমপ্লয়মেন্ট আন এমপ্লয়মেন্ট সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট যুবক-যুবতীদের ১৩.৯ শতাংশ এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীদের ৯.৮ শতাংশ এই রাজ্যে বেকার। পশ্চিমবঙ্গের কর্মক্ষম মানুষের ৫৩.৮ শতাংশই ক্যাজুয়াল লেবার হিসেবে যুক্ত। এদের ৮০ শতাংশের গড় রোজগার ৭,৪০০ টাকা। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা রাজ্যের অবস্থাও তথৈবচ। নবগঠিত তেলেঙ্গানা রাজ্যে ১.৫ লক্ষ সরকারী পদ শূন্য রয়েছে। কিন্তু মাত্র ন'হাজার কনস্টেবল পদ ও ১০০ গ্রুপ-২ পোস্টে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও ১.৫ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে যতটুকু কাজের সুযোগ, তা সরকারী ক্ষেত্রেই কারণ সেখানে কোন বেসরকারী উদ্যোগ নেই। স্বভাবতই এই রাজ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা সর্বাধিক। অথচ ঐ রাজ্যেরই রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের মন্তব্য, 'বেনিয়ম ও দুর্নীতি ব্যতিরেকে এই রাজ্যে সরকারী দপ্তরে কাজ পাওয়া যায় না।" সরকারী দপ্তরগুলিতে এই মুহূর্তে কত পদ শূন্য রয়েছে। তার কোন সরকারী পরিসংখ্যান ঐ রাজ্যে পাওয়া যায় না। তবুও অসমর্থিত সূত্র অনুসারে ঐ রাজ্যে ৪ লক্ষ সরকারী পদ শূন্য রয়েছে। কাশ্মীরে যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের বিপুল হার এবং সমগ্র অর্থনীতির বন্ধ্যাদশা সন্ত্রাসবাদের প্রতি যুব সমাজের আকৃষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ।

(২)

কোন দেশের 'শ্রমশক্তি' বলতে বোঝায় কর্মে নিযুক্ত এবং যাঁরা কর্মে নিযুক্ত নন, কিন্তু কাজের খোঁজে রয়েছেন, এঁদের মোট সংখ্যা। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে (নোটবন্দীর আগে) ভারতে মোট শ্রমশক্তি ছিল ৪৬ কোটি ৮০ লক্ষ। আমাদের দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা (সঠিক ভাবে ব্যবহৃত হলে) যে কোন দেশের অর্থনীতিতে আশীর্বাদ স্বরূপ। যদি এই নবীন কর্মক্ষম মানুষ গুলির উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। তাহলে দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধির হার হবে অভূতপূর্ব। এবং সাধারণ মানুষের জীবনমানেরও উন্নতি ঘটবে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে একদিকে যেমন ২০১৮ সালের শেষে বেকারীর হার দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশ বিশ্বে এর গড় হার ৫.৩ শতাংশ, তেমনি মোট শ্রমশক্তির মাত্র ৪৩ শতাংশ শ্রমে নিযুক্ত (সারা বিশ্বে গড় হার ৬৬ শতাংশ)। ''আচ্ছে দিন' আর কাকে বলে? □

# অভিজ্ঞতার নিরিখে রাজনৈতিক সংগ্রামে শামিল হোন

**বিজয় শংকর সিংহ**

৮-৯ জানুয়ারি, ২০১৯ সারা দেশজুড়ে ১২ দফা দাবিতে ৪৮ ঘন্টার নজিরবিহীন অভূতপূর্ব ধর্মঘট এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। প্রায় ২০ কোটি শ্রমিক কর্মচারীসহ শ্রমজীবী মানুষ এই ঐতিহাসিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রায় দু'মাস ধরে গ্রাম থেকে শহরের বুকে মানুষের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি তুলে ধরা ও তার প্রতিকারে বৃহত্তর সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচার করা হয়। দেশের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা আজ ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত। দেশের আরএসএস-বিজেপি সরকারের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বিগত ৫ বছরে দেশের সরকার তার শ্রেণী স্বার্থে আরো স্বৈরাচারী পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণের দাপটে সারা দেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ আর্থিক ও অধিকারগত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক কথায় সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার, জীবন-জীবিকা আজ নির্মমভাবে আক্রান্ত। পেট্রোপণ্যের লাগামছাড়া দরবৃদ্ধি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা। স্বাভাবিকভাবেই বিগত ৫ বছরের আরএসএস-বিজেপি শাসনে দেশের সাধারণ গরীব মানুষ বেঁচে থাকার ন্যূনতম রসদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশের সাধারণ মানুষ আজ অসহায় বোধ করছে।

গত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে আরএসএস-বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রতিবছর ২ কোটি বেকারের চাকরি দেবে, বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধার করে সাধারণ মনুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা জমা দেবে, এবং কৃষকদের ফসলের দেড়গুণ দাম নিশ্চিত করবে। দেশের মানুষের সাথে এককথায় গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করেছে।

এখন দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় গত ৪৫ বছরে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। ১ কোটি ৪০ লক্ষ কর্মরত যুবক-যুবতী গত ৫ বছরে কাজ হারিয়েছে। কালো টাকা আরো বিদেশে পাচার হয়েছে ও আরো পাহাড় জমেছে। দেশের মানুষের ব্যাঙ্কে জমানো হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সহায়তায় বিদেশে দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে কয়েকজন অসাধু ব্যবসায়ী। গত পাঁচ বছরে কৃষকদের আত্মহত্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর জি এস টি ও নোট বাতিলের ধাক্কায় মানুষ দিশেহারা। দেশের শ্রমিক, কর্মচারী, মধ্যবিত্তরা ও শ্রমজীবী মানুষ শোচনীয়ভাবে আক্রান্ত।

এছাড়া রাফালে ৩০,০০০ কোটি টাকার দুর্নীতি, মামলা চলছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফাইল হারিয়ে যাচ্ছে। অমিত শাহের পুত্রের ১৬ হাজার গুণ সম্পত্তি বৃদ্ধি ও অরুণ জেটলির কন্যার দুর্নীতিসহ একাধিক দুর্নীতি চলছে। ধান্দার ধনতন্ত্রে লুটেপুটে খাওয়ার রাজনীতি চলছে। সি বি আই তদন্ত শুরু করেছিল বলে আধিকারিকদের ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। আর এস এস ও বি জে পির আসল কঙ্কালসার কুৎসিৎ চেহারা প্রকাশ পেয়েছে। সি বি আই আধিকারিকদের ছুটিতে পাঠিয়ে আরএসএস অনুগত নাগেশ্বর রাওকে বসানো হয়েছে। বরিষ্ঠ আধিকারিককে ঐ পদে যুক্ত করেনি যা চরম বেআইনী কাজ হয়েছে। অতীতে কোনো দিন এরকম হস্তক্ষেপ হয়নি, যা দেশে নজিরবিহীন। প্রশাসনে, আর্থিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরএসএস-এর লোক বসানো সহ বেআইনীভাবে হস্তক্ষেপ করছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরও হস্তক্ষেপের নিন্দা ও প্রতিবাদ করছেন। এছাড়া রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নির্লজ্জভাবে সামরিক চুক্তি করে জুনিয়র পার্টনার হওয়া যা দেশের পক্ষে অপমানজনক ও স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত।

দেশের মানুষ বামপন্থীদের নেতৃত্বে বিগত ৫ বছর ধরে তীব্র লড়াই করেছে। পার্লামেন্ট অভিযান, মহারাষ্ট্রের লং মার্চসহ রাজ্যে রাজ্যে কৃষকদের আন্দোলন, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন, ছাত্র, যুব মহিলাদের একাধিক আন্দোলন যা মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

আড়াই দশক আগে বামপন্থীরা পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে ও বাইরে উদারনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তারা বলেছিল এই নীতি বিশ্বের যে দেশে গ্রহণ করেছে সেই দেশ দুর্নীতিতে তো ডুবেছে এবং বেকারী বৃদ্ধির ঘটনা সহ ধনী আরো ধনী হয়েছে, গরীব মানুষ আরো গরীব হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই নীতি সিংহভাগ মানুষের সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। ফলে লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে এবং মানুষ জবাব দেওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। গত ৫টি বিধানসভা নির্বাচন ও উপ-নির্বাচনগুলিতে দেশের মানুষ আর এস এস, বি জে পিকে পরাস্ত করেছে। আর এস এস ও বি জে পি কেউ অপরাজেয় নয় তা বুঝিয়ে দিয়েছে।

দেশের এই চরম অব্যবস্থা ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শ্রমিক-কৃষকের অটুট বন্ধন সব অংশের মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে এবং এই পরিস্থিতি থেকে তারা মুক্তি পেতে চাইছে। তারা বুঝেছে আড়াই দশকের উদারনীতি আজ কানাগলিতে প্রবেশ করেছে এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষ প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই সময় মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে আর এ স এস বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি করছে। একে মোকাবিলা করতে আমাদের আরো ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় দৃঢ়তার সাথে বিকল্প ভাষ্য তুলে ধরতে হবে।

লোকসভা নির্বাচন সামনে এলেই আরএসএস-বিজেপি মানুষের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরী করে বিভেদ সৃষ্টি করে ভোটের রাজনীতি করে। নির্বাচন এলে নাগপুরের নির্দেশে রামমন্দির প্রতিষ্ঠার জিগির তোলে। এবার দেখল ভুখা মানুষ খাদ্য চায় রাম মন্দির চায় না। তাই শুরু হয়েছে অতীতের কার্গিল, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক-এর মতো কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদের নৃশংস আক্রমণে শহীদ হওয়া সৈন্যদের দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে যুদ্ধান্মোদনার সৃষ্টি করা। এবং মানুষের মধ্যে যুদ্ধান্মোদনার পরিস্থিতি তৈরী করে ভোটের রাজনীতি করা। কাশ্মীরের উত্তেজনা আর পাকিস্তান নিয়ে যুদ্ধ জিগির সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি করছে।

দেশের মানুষ জানতে চাইছে কাশ্মীরে নির্বাচিত রাজ্য সরকার ফেলে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে অর্থাৎ রাজ্যপালের শাসন, তাহলে কাশ্মীরে দেশের জমিতে সন্ত্রাসবাদীর বিস্ফোরণ ঘটালো, ৪৪ জন সেনা মারা গেলেন, গোয়েন্দা দপ্তর কি করল? কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নেই? তদন্ত হওয়া উচিত। সোশ্যাল ওয়েব সাইটে ব্যাপক মানুষের মধ্যে প্রচার করার চেষ্টা হল যুদ্ধ জিগির তোলার। সচেতন শিক্ষিত মানুষ আসল চেহারা উন্মোচন করে তাদের উদ্দেশ্য ভেস্তে দিয়েছে।

নিজের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে গেল গোয়েন্দা দপ্তর ডাহা ফেল করল। আর পাকিস্তানের সীমানা থেকে ৮০ কিলোমিটার ভেতরে সন্ত্রাসবাদী ঘাটি দেখে হাজার কিলোগ্রাম বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো আর এস এস-বি জে পি পরিচালিত সরকার আর বশংবদ কর্পোরেটে পুঁজি পরিচালিত প্রচার মাধ্যম তাদের শ্রেণী স্বার্থে প্রচার করল ২৫০, ৩০০, ৪০০ সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে। মানুষ বলল গুনলো কে? পরে দেখা গেল আন্তর্জাতিক বড় প্রচার মাধ্যমগুলি বলল ২টি কুঁড়ে ঘর, কিছু পাম গাছ ও একটি কাক মারা গেছে। আর এস এস-বি জে পি ও দেশের কর্পোরেটে পরিচালিত প্রচার মাধ্যমগুলির মিথ্যার কলুষিত প্রচারের ফানুস বেলুনের মতো ফেটে গেল, মানুষ বুঝেছে যে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। এখন নিহত সৈনিকের পরিবার বলছে যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। এতে দু'দেশের মন্ত্রী, রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা চাই। পাকিস্তানে পার্লামেন্ট বসিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমরা শান্তি চাই। অভিনন্দনকে ফেরৎ দেবেন শুধু তাই না, বললেন আলোচনা করে মীমাংসা করতে চাই। আর জোট নিরপেক্ষ দেশ, শান্তির দূত হিসাবে সারা বিশ্বের কাছে পরিচিতি, সেই সম্মান ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে ৫৬ ইঞ্চি প্রধানমন্ত্রী ৫ বছরের শাসনে ব্যর্থতার লোহার মেডেল ঝুলিয়ে, নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে বলছেন 'বদলা চাই'। আমাদের কাছে আশার দিক এটা যে দেশের মানুষ বুঝে গেছে যে বেলুন চুপসে গেছে এবং উপযুক্ত জবাব দিতে মনস্থির করে ফেলেছে।

দেশে উদারনীতির তিন দশকের মধ্যে ইউপিএ ১ সরকার-এর সময়কালে সাধারণ মানুষ বামপন্থীদের ৬১ জন সাংসদকে নির্বাচিত করে নিয়ামক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সাধারণ মানুষ দেখেছেন মন্ত্রিসভায় না গিয়েও দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রেগা, আদিবাসীদের বনের অধিকার, খাদ্য সুরক্ষা আইনসহ একাধিক শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষায় স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিল বামপন্থীরা। আজও বিশ্ব মন্দার ফলে দেশে প্রভাব পড়লেও ব্যাপক ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছে দেশপ্রেমিক হিসাবে বামপন্থীদের লড়াই। মানুষ এসব থেকে শিক্ষা নিয়ে এখন বুঝতে পারছে প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও দেশের স্বার্থরক্ষাকারী একমাত্র বামপন্থীরাই।

আমাদের রাজ্যেও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সর্বত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম আন্দোলন শুরু হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে, পাড়ায় পাড়ায় সমাজবিরোধী ও লুম্পেনদের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের নেতৃত্বে মানুষ সোচ্চার হচ্ছে। শ্রমিক-কৃষকের বন্ধন আরও মজবুত হচ্ছে। মধ্যবিত্ত কর্মচারীসহ ছাত্র, যুব মহিলারা সাহসের সাথে রোজ রাস্তায় চোখে চোখ রেখে কথা বলছে। রোজই যুব সমাজ স্লোগানে মুখরিত হয়ে ভয়কে জয় করেই সংগ্রামী মেজাজে রাস্তায় আছে। যার প্রতিফলন ঘটেছিল সারা রাজ্য থেকে আক্রান্ত মানুষরে উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়েছিল দেশের ও রাজ্যের শাসক দলের বুকে কম্পন ধরিয়ে পিত্তপিলস ব্রিগেডে।

প্রশাসনের অভ্যন্তরে মধ্যবিত্ত কর্মচারীরাও অপশাসনের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে ধারাবাহিক আন্দোলন করছে। বিগত বছরগুলিতে ও বর্তমান সময়ে এই ভয়ংকর আক্রমণ, সন্ত্রাস ও ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করেই একের পর এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমরা যুক্ত হয়েছি। কলকাতার রাজপথে ও রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায় গণ অবস্থান, কেন্দ্রীয় মিছিল সংগঠিত করেছি।

বর্তমান সময় দাবি করছে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে অনেক হয়েছে আর নয় (offence is the best defence) এই মনোভাব নিয়েই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যাওয়া এবং সক্রিয়ভাবে দৃঢ়তার সাথে গর্জে ওঠার। বকেয়া মহার্ঘভাতা, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত প্রদান, লক্ষাধিক শূন্যপদ পূরণ, চুক্তি প্রথায় কর্মচারীদের সমকাজে সম বেতন, নিয়মিত কর্মচারীদের মত সুযোগ সুবিধা দেওয়া ও রাজ্যের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবান্ন অভিযানের কর্মসূচীতে সাধারণ সম্পাদক সহ নেতৃত্ব শৃঙ্খলাপরায়ণ সেনানির মত পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে নবান্নে প্রবেশ করে এবং টিফিনের সময় (ব্যক্তিগত সময়) বুকে এ্যাপ্রন পড়ে বিক্ষোভ দেখান। রাজ্য সরকার ও তার দল রাজনৈতিকভাবে যুক্তি তর্কে আলোচনায় মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে তাই আতঙ্কগ্রস্ত ও হতাশা থেকে নেতৃত্বকে অ্যারেস্ট ও দূরদূরান্তে বদলী করেছে। এতে আমরা মনেকরি আমাদের সংগঠনকে এভাবে দুর্বল করা যাবে না, কর্মচারী সমাজ দাবালনলের মতো ফুঁসছে। সংগঠন সর্বস্তরে আরো মজবুত হচ্ছে ও আগামী রাজনৈতিক সংগ্রাম উপযুক্ত জবাব দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সারা রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা ১৪ তলার মহারানীকে হুঁশিয়ারী দিচ্ছে।

বর্তমানে বকেয়া ৪১ শতাংশ মহার্ঘভাতা ও ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত প্রদানসহ ৫ দফা দাবিতে আগামীদিনে সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়ার জন্য সর্বত্র প্রস্তুতি চলছে।

তাই চরম আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে, রাজ্যের গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিতে এবং সারা দেশ ও রাজ্য জুড়ে ৮-৯ জানুয়ারি, ২০১৯ আটচল্লিশ ঘণ্টার ঐতিহাসিক ধর্মঘটের ব্যাপক সাফল্যকে সংহত করেই সামনে ঘোষিত লোকসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক সংগ্রামে দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা ও দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে চরম উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তি আরএসএস-বিজেপিকে পরাস্ত করে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধিসহ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি প্রতিষ্ঠিত করা এবং রাজ্যের গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে এই বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি সর্বত্র ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে তুলতে হবে। □

# জেলায় জেলায় নারী দিবসের কর্মসূচী

বীরভূম

উত্তর দিনাজপুর

পুরুলিয়া

হাওড়া

উত্তর ২৪ পরগনা

আলিপুর দুয়ার

দার্জিলিং

| | | |
|---|---|---|
| দার্জিলিং | ঃ | সভাপতি ঃ মলিনা হালদার, আলোচক ঃ মিনতি নাগ, কল্পনা ভৌমিক। |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | ঃ | আলোচক ঃ তপতী ঘোষ |
| উত্তর ২৪ পরগনা | ঃ | আলোচক ঃ রেখা গোস্বামী |
| দক্ষিণ দিনাজপুর | ঃ | সভাপতি ঃ কৃষ্ণা ঘোষ, আলোচক ঃ সমাপ্তি পণ্ডিত ও পলাশ দেব |
| মালদহ | ঃ | আলোচক ঃ দেবলা মুখার্জী |
| হাওড়া | ঃ | সভাপতি ঃ শেফালী নস্কর, আলোচক ঃ রেখা চক্রবর্তী |
| পুরুলিয়া | ঃ | সভাপতিমণ্ডলী ঃ পিয়ালী সাহা, মীরা সেনাপতি ও নিগার সেন, আলোচক ঃ অনিমা দেওঘরিয়া ও সুপ্তি সহিস। |
| জলপাইগুড়ি | ঃ | আলোচক ঃ রুবিয়াঙ্কা নন্দী ও রীনা সরকার |
| বাঁকুড়া | ঃ | সভাপতি ঃ ধর্মদাশ ঘটক, রত্না সরকার, যদুনাথ মুখার্জী, আলোচক ঃ শীলা ব্যানার্জী |

এছাড়াও বীরভূম ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও উক্ত কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়েছে।

# স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আর এস এস

স্বাধীনতা আন্দোলনে কখনও অংশ নেয়নি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আর এস এস প্রতিষ্ঠাতা নেতা হেডগাওয়ার নিজে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন ১৯৩১-র আইন অমান্যে জেলেও গিয়েছিলেন। কিন্তু আর এস এসের নামে যাতে ব্রিটিশ বিরোধিতায় না জড়ায়, আইন অমান্যে যোগ দেবার আগে নিজের দায়িত্ব দিয়ে যান অন্য একজনকে। আর গোলওয়াল করে তো স্পষ্ট বলেছিলেন ঃ ''ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও অভিন্ন বিপদের তত্ত্ব আমাদের জাতি সংক্রান্ত ধারনার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ানোয় প্রকৃত হিন্দু জাতিতত্ত্বের ইতিবাচক ও প্রেরণাদায়ী উপাদান থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। স্বাধীনতা সংগ্রাম কার্যত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধিতাকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এক করে দেখা হচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী স্বাধীনতা সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাস। এই সংগ্রামের নেতাদের এবং সাধারণ মানুষের ওপর বিপর্যয়ের প্রভাব ফেলেছে।'' মোদ্দা কথা হলো ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিং-সূর্য সেনের মতো শত শহীদ হলেন প্রতিক্রিয়াশীল, তাঁরা প্রেরণার উৎস নন।

১৯৪২-র ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র কমিশনার জানিয়েছিলেন ''আর এস এস আইন শৃঙ্খলার বিপদ নয়'' বলাই বাহুল্য, তখন স্বাধীনতা যোদ্ধারাই ছিলেন ব্রিটিশদের চোখে 'আইনশৃঙ্খলার বিপদ'। বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ১৯৪২-এ স্পষ্টই জানাচ্ছে ''সংঘ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে আইনের মধ্যে রেখেছে। বিশেষ করে ১৯৪২-র আগস্টের গোলমালে তারা অংশ নেয়নি।'' □

# 'উন্নয়ন'-র ধাক্কায় দেউলিয়া রাজ্য

● ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে, বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে রাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১.৯৩ লক্ষ কোটি টাকা। তৃণমূল সরকারের সাত বছরে এই ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে সর্বমোট ঋণের পরিমাণ যা উল্লেখ করা হলো, তা স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবাংলায় ৬৪ বছরে মোট পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ। অর্থাৎ বার্ষিক গড় ঋণের পরিমাণ ছিল .০৩ লক্ষ কোটি টাকা। তৃণমূল শাসনের ৭ বছরে মোট ঋণের পরিমাণ (৩.৬৬-১.৯৩) লক্ষ কোটি টাকা = ১.৭৩ লক্ষ কোটি টাকা। বার্ষিক গড় ঋণের পরিমাণ .২৫ লক্ষ কোটি টাকা।

● বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে, রাজ্যের মোট ঋণের সিংহভাগই (প্রায় ৮৬ শতাংশ) ছিল স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প থেকে গৃহীত ঋণ। যা ছিল বাধ্যতামূলক। কারণ স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সঞ্চিত অর্থকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঋণ হিসেবেই পায় রাজ্য সরকার। ঐ সময় ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে মোট জমা অর্থের নিরিখে রাজ্যের স্থান ছিল এক নম্বরে। কিন্তু তৃণমূল শাসনে স্বল্প সঞ্চয়ে ভাটা পড়ে। পরিবর্তে রমরমা হয় বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থার। ফলে তৃণমূল শাসনে করা ঋণের বড় অংশই বাজার থেকে করা। ২০১৪-১৫ সালে রাজ্য সরকার ঋণের বাজার থেকে ধার করার ফলে, ধারের অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় ২.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ সালে ধারের অঙ্ক হয় ২.৯৯ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ সালে ৩.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা এবং ২০১৭-১৮ সালে ৩.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা।

● রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির কথা বলেছেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এ রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি সংগঠিত বা উৎপাদনধর্মী ক্ষেত্র থেকে ঘটেনি। মূলত ঘটেছে আবগারি বিভাগ থেকে। প্রতিটি গ্রামে মদের দোকান খোলার অনুমোদন দিয়েছে আবগারি বিভাগ। এর পাশাপাশি লটারির নামে জুয়া খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমে মাসিক, তারপরে সাপ্তাহিক এবং সবশেষে দৈনিক।

● দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ফসলের ন্যূনতম ন্যায্য মূল্য দিচ্ছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কৃষকের আয় তাঁর আমলে তিনগুণ বেড়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র কী?

● স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ধানের ন্যূনতম সহায়কমূল্য হয় কুইন্টাল প্রতি ২৩৪৫ টাকা। কিন্তু কেন্দ্রের ঘোষণা অনুযায়ী ধানের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ১৭৫০ টাকা। স্বামীনাথন কমিশনের প্রস্তাবের তুলনায় ৫৯০ টাকা কম। রাজ্য সরকার ১৭৫০ টাকার ওপর ২০ টাকা করে বোনাস দেয়। যে সমস্ত রাজ্য বোনাস দেয়, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বোনাসের পরিমাণ সব থেকে কম। সর্বোচ্চ বোনাস দেয় কেরালা সরকার। সেখানে বোনাসের পরিমাণ ৬০০ টাকা। কেরালায় কুইন্টাল প্রতি ধানের সহায়কমূল্য স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশের থেকে বেশি।

● প্রকৃত অবস্থ হলো, এ রাজ্যের কৃষকরা কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত সহায়ক মূল্যও পান না। কুইন্টাল প্রতি ধান উৎপাদন করতে চাষির গড় খরচ হয় ১৫০০ টাকা। কিন্তু ধার-দেনা মেটানোর জন্য ধান ওঠার পরেই চাষিকে ফড়েদের কাছে ১৩৫০-১৪৫০ টাকায় বিক্রী করে দিতে হয়। ফড়েরা সেই ধান সরকারী সংগ্রহ কেন্দ্রে বিক্রী করে ১৭৫০ টাকায়। কৃষকরা সংগ্রহ কেন্দ্রে পৌঁছোনোর আগেই ফড়েরা ধানের দখল নেয়। □

# ৬ দফা দাবীতে কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার কেন্দ্রীয় জমায়েত

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে, ৬ দফা দাবীতে জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের প্রধান সচিবের নিকট ডেপুটেশন ও কেন্দ্রীয় জমায়েত কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় গত ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৯, কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে।

সভার শুরুতেই সমিতির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। কেন্দ্রীয় জমায়েত কর্মসূচীতে ১০৩৩ বিভাগীয় আদেশনামা বাতিল, পদোন্নতি, শূন্যপদে স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ, একমুখী প্রশাসন সহ ৬ দফা দাবী প্রস্তাব পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক প্রশান্ত চন্দ। ৬ দফা দাবীসমূহের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল রায় বলেন, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের বৃহত্তম ও একমাত্র কর্মচারী সংগঠন হিসাবে ২০০৯ সালের ১২ অক্টোবর খাদ্যভবনে কেন্দ্রীয় জমায়েতের মধ্য দিয়ে আমরা বিভাগীয় আদেশনামা ১০৩৩ বাতিলের দাবীতে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। একাধিকবার আমরা সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ডেপুটেশন কর্মসূচী করেছি। আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে পড়েই বিভাগীয় আধিকারীকেরা আমাদের প্রধান দাবীগুলিকে মান্যতা দিয়েছেন এবং ১০৩৩ আদেশনামা বাতিল, শূন্য পদে নিয়োগ, পদোন্নতির বিষয়গুলিকে বিবেচনার জন্য অর্থ দপ্তরে আবেদন জানানো হবে বলে জানান।

এই কেন্দ্রীয় জমায়েক কর্মসূচীর প্রধান বক্তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ বলেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অভ্যন্তরে, কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থা একটি লড়াকু সংগঠন। সমিতির সমস্ত প্রকার আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মসূচীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সর্বদা পাশে রয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার সরকারী কর্মচারীদের প্রতি প্রতিহিংসার রাজনীতি করে যাচ্ছেন। আমাদের নেতৃত্বকে , বকেয়া ডিএ ও ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন দাবী করায় দূর দূরান্তে বদলী করেছে। বকেয়া ডিএ ও ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের প্রস্তাবনা পেশ ও প্রকাশ এবং বাস্তবায়নের দাবীতে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত প্রকার দাবী আমরা আন্দোলনের পথ ধরেই আদায় করবো। দেশে একটা অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্মের নামে শ্রমজীবি মানুষকে ভাগ করতে চাইছে। রাজ্যের লুম্পেনদের রাজত্ব চলছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ শাসকদলের দ্বারা কোনো না কোনোভাবে আক্রান্ত। আগামী রাজনৈতিক সংগ্রামে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে মত প্রকাশ করতে হবে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক কর্মচারী সদস্য বন্ধু প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অমিতাভ সাহা, বিদেশ বেরা ও চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

## রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ

রিপোর্টের কিছু তথ্য ২০১৯-র জানুয়ারিতে সামনে এসেছে যা বাজপেয়ী শাসনের সময় আদালতে পেশ হয় নি। সংঘ পরিবারের দাবি নস্যাৎ করার বেশ কিছু প্রমাণ সেই নতুন তথ্যে মিলেছে, যা সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন মামলায় আগামী দিনে আসার সম্ভাবনা।

ব্রিটিশ ভারতে সরকারী নীতিই বিভেদ সৃষ্টি করা। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে অসাধারণ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পর ব্রিটিশ শাসকদের বিভেদ সৃষ্টির কৌশল নতুন মাত্রা পায়। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ বেশিরভাগ তার দ্বারা প্রভাবিতও হন। এই ব্রিটিশ ছকেই ১৮৬০ সালে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের রাজ কর্মচারী প্যাট্রিক কার্নেগী লেখেন যে, বাবরের আমলেই মন্দির ভাঙা হয়। এই মিথ্যা ও বিকৃতিকে আজও ব্যবহার করে চলেছে হিন্দু মৌলবাদীরা।

প্রখ্যাত অধ্যাপক আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন— ''...রামায়ণ কোনো একজন কবির সাহিত্য কীর্তি, যাঁর নাম দেওয়া হয়েছে বাল্মীকি এর পিছনে ইতিহাসের বিন্দুমাত্র প্রমাণ নেই। ভারতীয় ইতিহাসের কোনো পণ্ডিতই এখন মনে করে না যে রামায়ণের রাম এমন এক ঐতিহাসিক চরিত্র, যাঁকে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে চিহ্নিত করা যায়।'' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন রামায়ণ আমাদের দেশের একটি মূল্যবান মহাকাব্য। অর্থাৎ রামায়ণ মহাকাব্যের একটি চরিত্র রাম, তাকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে দাবি করে, তার জন্মস্থান নিয়ে বাবরি মসজিদ-রামমন্দির বিতর্ক জিইয়ে রেখেছে সংঘ পরিবার।

যদি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমান পাওয়া যেত যে ঐ বিতর্কিত স্থানে অতীতে রামমন্দির ছিল—তাহলেও একটি ঐতিহাসিক সৌধ (বাবরি মসজিদ)-কে গুঁড়িয়ে দেওয়া কি সভ্যতর পরিচয়? এই সূত্র ধরে যদি এগোতে হয় তাহলে তো মধ্যযুগীয় বর্বরতায় ফিরে যেতে হয়। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

## কর্মসংস্থানের ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি

সৃষ্টি হলে তা হত প্রশংসার্হ, যদিও সরকারের নিজের চাপিয়ে দেওয়া এই তথ্যই বলে দিচ্ছে ঘাটতি আছে।

এই পরিসংখ্যানগুলির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল নতুন রেজিস্ট্রেশন হয়েছে মানেই তত সংখ্যক প্রকৃত কাজ সৃষ্টি হয়েছে এমন নয়, বরং কর্মরতদের মধ্যে যারা এখনও সংশ্লিষ্ট কোনো একটি স্কিমেরও সুযোগ পায়নি তাদের অন্তর্ভুক্তি বোঝায়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ এই স্কিমগুলিতে শ্রমিকদের সুবিধা দেবার জন্য সরকার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রণোদনামূলক সুবিধা প্রদান করছে। ফলত, সংগৃহীত তথ্যগুচ্ছ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির তুলনায় একটি 'আনুষ্ঠানিক রূপদান' এর পদ্ধতিকে নির্দেশ করে যাতে কর্মরত শ্রমিকরা (যারা আগে কোনো স্কিমে ছিল না তারা) যেকোনো একটি স্কিমের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হয়েছে।

এছাড়াও একই শ্রমিক একাধিক স্কিমে নথিভুক্ত হওয়ার ফলে একজনকে একাধিকবার গোনার সম্ভাবনাও থাকছে। কর্মরতদের মধ্যে মাত্র ১২.৫ শতাংশ এইরকম প্রথানুগ শ্রমিকের আওতায় পড়ে এই তথ্য যুক্ত করে নিলে যেটা দাঁড়ায় তাতেও সংখ্যাটা প্রচারযোগ্য হয়ে ওঠে না। কর্মসংস্থানের একটা প্রশংসনীয় প্রবণতার প্রমাণ হয়ে ওঠা তো দূর অস্ত। আশ্চর্যের নয় যে কর্মসংস্থানের সামগ্রিক প্রবণতার ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যানগুলিকে সূচক হিসাবে ব্যবহার ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়েছে।

যখন এরকম মারকাটারি প্রচার চলছে তখন কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যানের থেকে নজর ঘোরানোর জন্য সরকার এখন বলছে, আরও গুরুত্বপূর্ণ যে কাজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে তা হলো উদ্যোগপতি সৃষ্টি (যদিও উদ্যেগপতিরা ঠিক কর্মসন্ধানী নয় বরং নিয়োগকর্তা) এবং কর্মদক্ষতা উন্নয়ন যাতে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা ও সম্ভাবনাময়তা তৈরী করা যায়। 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' এবং 'স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া'র মতো অকার্যকর স্কিমগুলির পাশাপাশি স্বনিযুক্তিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য মুদ্রা (মাইক্রো ইউনিটস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফাইনান্স এজেন্সি) স্কিমের মাধ্যমে ছোট ব্যবসা শুরু করা বা বাড়ানোর জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিকে ঋণ দেওয়া হবে। যদিও প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার ঋণে সুদের হার ৯ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত, সেখানে কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি। প্রকৃত সুবিধা বলতে সুদের ক্ষেত্রে ৬ মাসের 'মরিটরিয়াম' অর্থাৎ ঐ সময়ে সুদের পরিমাণ পরিশোধ বন্ধ রাখার সুবিধা পাওয়া যাবে, নিয়মিত পরিশোধের ক্ষেত্রেও শেষে সুদের হার কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হবে এবং ঋণের ক্ষেত্রে কোনো বন্ধক লাগবে না। এই সুবিধাগুলি সত্ত্বেও এই স্কিমে নেওয়া ঋণ লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে রয়েছে। এককথায়, প্রণোদনার প্রচেষ্টাই হোক বা কর্মসংস্থান সৃষ্টির বাহ্যত উদ্ভাবনমূলক প্রকল্প, সবই লক্ষ্যহীন। এইরকম চটজলদি সমাধানে কোনো কাজ হবে না এবং মোদির নেতৃত্বে এনডিএ-র শাসনকালে কর্মসংস্থানের যে অন্ধকারময় চিত্র তারজন্য তাদের গুণাগার দিতে হবে। □

*অনুবাদ : শাশ্বতী মজুমদার*

*সৌজন্য : ফ্রন্টলাইন, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯*

# ভারতে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিবাদ

**নোয়াম চমস্কি, জেমস পেত্রাস, অ্যাঞ্জেলা ডেভিস, ফ্রেডরিক জেমসন, ব্রুনো লাট্যুর, ইলান পেপ সহ ৬৩ জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রতি একটি যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন। যে বিবৃতিতে দেশজুড়ে গ্রেপ্তার, হুমকি ও হিংসার মধ্য দিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের বুদ্ধিজীবীরা ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।**

''ভারতে সব ধরনের প্রতিবাদের ওপর ভয়াবহ দমনপীড়ন নামিয়ে আনা হচ্ছে'' শীর্ষক এই প্রতিবাদ পত্রে বলা হয়েছে— ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই ভারতে সব ধরনের রাজনৈতিক বিরোধিতার কণ্ঠ রোধ করার এক ভয়ংকর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কয়েকমাস আগে মহারাষ্ট্র পুলিশ বেশ কয়েকজন সুপরিচিত মানবাধিকার কর্মীকে ভীমা-কোরেগাঁও মামলায় গ্রেপ্তার করেছে, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভারভারা রাও, অরুণ ফেরেইরা, ভার্নন গঞ্জালভেস, সুধা ভরদ্বাজ, গৌতম নভলাখা এবং অন্যান্যরা।

একইভাবে বেশ কয়েকবছর আগে দিল্লী বিশ্ব বিদ্যালয়ের অদ্যাপক জি এম সাইবাবা এবং রাজনৈতিক কর্মী কোবাড ঘান্ডিকে মিথ্যে মামলায় জেলে পোরা হয়েছিল। এই সমস্ত সামাজিক কর্মীদের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। নাগরিক ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁরা এখন, সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং সমাজে সমস্ত ধরণের শোষনের শিকার যাঁরা, তাঁদের প্রতিবাদহীন কণ্ঠে, প্রতিবাদের ভাষা যোগাতে পেরেছেন।

জনপন্থী বুদ্ধিজীবী, লেখক এবং কবি হিসেবে তাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশ্ন করার ক্ষমতা সৃষ্টি এবং সামাজিক ন্যায়বোধ গড়ে তোলার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

মোদীর ভারতে দলিত (তথাকথিত অস্পৃশ্য), আদিবাসী, যুক্তিবাদী, মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতন মানবাধিকার সংগঠন ও অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের ওপর ভয়ংকর আঘাত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তীব্রতর হচ্ছে। মোদী সরকার তার হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের যে সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক কর্মসূচী, তার অংশ হিসেবেই প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করছে যে কোন ধরনের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার জন্য। সরকার বিভিন্ন আইনী এবং আইন বহির্ভূত পদ্ধতিকে ব্যবহার করছে গণতান্ত্রিক, যুক্তিবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে দমন করার জন্য। সাম্প্রতিক বছরগুলিকে ক্ষমতাসীন দলের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ঝটিকা বাহিনী বহু যুক্তিবাদী, সাংবাদিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে খুন করেছে।

এছাড়াও শাসকদল বিভিন্ন আইনানুগ পদ্ধতির মাধ্যমে, সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য যে সমস্ত সমাজ কর্মীরা লড়াই করছেন, দমনমূলক উপায়ে তাঁদের আটক করছে ও জেলবন্দী করছে। এঁদের কারান্তরালে পাঠানোর জন্য সরকার প্রথমে বশংবদ গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে প্রচার করছে যে এঁরা রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্ত।

এইভাবে একের পর এক ষড়যন্ত্রের গল্প তৈরী করে, কেন্দ্রীয় সরকার ও মহারাষ্ট্র সরকার যৌথভাবে কঠোর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক আইনকে ব্যবহার করে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের জেলে পোরার ব্যবস্থা করেছে।

একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার ফলে সৃষ্ট সংকটের সময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বিশ্ব নাগরিক সমাজের দায়িত্বের প্রশ্নটি সামনে এসে যায়। যদি সুপ্রীম কোর্ট সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে এবং বিচার ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্রীয় হিংসার যারা শিকার তাদের প্রতি সুবিচার করতে না পারে, তখন নাগরিকদের কর্তব্য কি?

এই ধরনের সমস্ত অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপের ফলে, ভারতীয় রাষ্ট্র দৃশ্যত তার সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ধর্ম নিরপেক্ষ মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে।

সমস্ত ধরনের দমনমূলক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে মোদী সরকার, যে সমস্ত মানুষ সরকারের নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতি ও উগ্র জাতীয়তাবাদী কর্মসূচীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, তাঁদের মনে ভয় ও শঙ্কার সৃষ্টি করতে চাইছে। আমরা নাগরিক/মানবাধিকার কর্মী হিসেবে এই ধরনের জ্বলন্ত বিষয়গুলি নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন।

আমরা সমস্ত ছাত্র, শ্রমিক কর্মচারী- শিক্ষাবিদ, লেখক, সামাজিক ন্যায় কর্মী এবং অনাবাসী ভারতীয়দের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন করছি, এই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলি সম্পর্কে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা এবং সকল বন্দী অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের দ্রুত মুক্তির দাবি উত্থাপন করার জন্য। নাগরিক ও অভিবাসী হিসেবে আপনাদের কণ্ঠ, জনমত গঠনে এবং বেআইনীভাবে আটক কর্মীদের মুক্তির দাবিতে গড়ে ওঠা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে গণতন্ত্র, ন্যায় ও মতপ্রকাশের অধিকারের প্রতি আপনাদের সমর্থন ভারতে অধিকার আন্দোলনের কর্মী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মনোবল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। আমরা আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই বিশ্বায়িত প্রচারে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি সংহতি প্রকাশের জন্য।

স্বাক্ষর : (১) নোয়াম চমস্কি (২) জেমস পেত্রাস (৩) অ্যাঞ্জেলা ওয়াই ডেভিস (৪) ফ্রেডরিক আর জেমসন (৫) ব্রুনো লাট্যুর (৬) জুডিথ বাটলার (৭) গোরান থেবর্ণ (৮) ডন্না হারাওয়ে (৯) মেরি ফ্রান্সিস বেরি (১০) হেনরী ভেল্টমেয়ার সহ মোট ৬৩ জন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী। □

# ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা

ত্রিপুরায় এক বছর হলো একটানা ২৫ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে হঠিয়ে সরকার গঠন করেছে বিজেপি-আই পি এফ টি জোট সরকারের এই এক বছরে সেখানকার মানুষ তথা সরকারী কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ।

সরকারে আসার আগে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল কেন্দ্র ও রাজ্যে একই শাসকদল থাকলেই সম্ভব হবে প্রতিটি বেকারের চাকরি, শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য কার্যকরী হবে সপ্তম বেতন কমিশন অনুযায়ী বেতনের বিপুল বৃদ্ধি, সামাজিক ভাতাগুলির পরিমাণ হবে ২০০০ টাকা। রেগা শ্রমিকদের মজুরি এক লাফে বেড়ে যাবে ৩৪০ টাকা।

ক্ষমতায় আসার পর আসলে যা হয়েছে—

বামফ্রন্ট সরকারেরআমলে শিক্ষক-কর্মচারীদের অধিকার, চাকুরির নিরাপত্তা, নিশ্চিত পেনশনের অধিকার, কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের দাবি জানানোর অধিকার---এগুলি একে একে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। পঞ্চাশ বছর বয়স অথবা তিরিশ বছর চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হলে ছয় মাস পর পর দক্ষতা মূল্যায়ন করা এবং ব্যর্থ হলে চাকুরিচ্যুতির আতঙ্ক আজ রাজ্য কর্মচারীদের গ্রাস করেছে। রাজ্যের সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্থগিতাদেশ জারি হয়েছে। আগের সরকারের আমলে টিপিএসসি-র মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরে চূড়ান্ত হওয়া সব নিয়োগ প্রক্রিয়াই বাতিল করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০১৮ থেকে ত্রিপুরায় নিউ পেনশন স্কীম চালু হয়ে গেছে। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত অসংখ্য ডি আর ডব্লিউ ও কন্টিনজেন্ট কর্মী যারা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্তে নির্দিষ্ট সময় চাকুরি করার পর নিয়মিত কর্মচারী হিসাবেই গণ্য হতেন, বর্তমান সরকার বিগত সরকারের সেই আদেশনামা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কর্মরত অবস্থায় মৃতের পোষ্যের চাকুরি প্রদানের বিষয়টি স্থগিত রয়েছে। বন দপ্তরের ছয় শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, মিড ডে মিল শ্রমিক ও অঙ্গনওয়ারি কর্মী ছাঁটাই অব্যাহত থাকলেও বাঁকাপথে খোদ সচিবালয়ে কিছু নিয়োগ হচ্ছে। ত্রিপুরায় সপ্তম পে-কমিশন দেবার নামে গঠিত ভার্মা কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী আর কিছুদিনের জন্য গ্রুপ-ডি পদটি থাকবে। অর্থাৎ অচিরেই পদটি তুলে দেবার পথটি উন্মুক্ত করা হলো। বর্তমান সরকারের আমলে ছাঁটাই, সাসপেনশন, ডাইজ-নন, শোকজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস, ১মে-র ছুটি বাতিল করা হয়েছে। রাজ্যে বামফ্রন্ট আমলে চালু থাকা বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের (৩ ডিসেম্বর) ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির প্রতিটি বিভাগীয় দপ্তর বা শাখা অফিসগুলি রাজনৈতিক দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত। টি জি ই এ সহ অন্য সংগঠনগুলিও আক্রান্ত। কোনো কোনো অফিস জবরদখল, ভাঙচুর, আগুন লাগানো হয়েছে বা গেরুয়া রঙ করে ''গৈরিক সাংস্কৃতিক সদন'' নাম দেওয়া হয়েছে। বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও ধর্মনগর, বড়পাথারীসহ বিভিন্ন দপ্তরে গেড়ুয়া সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব বর্বরতায় পুলিশ নির্বিকার। নির্বিচারে কর্মচারীদের বদলী করতেই প্রশাসন ব্যস্ত। তোলা দিতে অপারগ হওয়ার জন্যও শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন কর্মচারীরা। পশ্চিমবঙ্গে, ২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অবস্থা এবং প্রশাসনের আচরণের সাথে নবগঠিত ত্রিপুরা সরকারের অদ্ভুত মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে না কি? □

# রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা

**রাজ্যে পরিবর্তন প্রসঙ্গে**

''অবশেষে দুঃশাসনের অবসান। গত ৩৪ বছর ধরিয়া বাংলার বুকের উপর ফ্যাসিবাদী দলতন্ত্রের যে জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিয়াছিল, রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই পাথরকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে।... ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী সরকার ও ক্যাডারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারই নেতৃত্বে তৃণমূল জোটের এই বিরাট জয়।'' রাজ্যে তথাকথিত পরিবর্তন সম্পর্কে এটিই ছিল আর এস এস এ-র অনুধাবন। উপরোক্ত বাক্য কয়টি আর এস এস-র পশ্চিমবঙ্গ কমিটির মুখপত্র 'স্বস্তিকা' থেকে নেওয়া। ২৩ মে ২০১১ ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয়র অংশ এটি। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের আগেও বামফ্রন্টকে পরাস্ত করে তথাকথিত 'পরিবর্তন'-র পক্ষেই প্রচার চালিয়েছিল আর এস এস-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা। মমতা ব্যানার্জীর ভূয়সী প্রশংসাও করা হয়েছিল।

**পরিবর্তনের পর রাজ্যে সংঘের প্রসার ঘটেছে**

২০১১-তে সরকার পরিবর্তনের পর মমতা ব্যানার্জীর আমলে আজ পর্যন্ত আর এস এসের শাখার সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি ঘটেছে তা স্বাধীনতার পর ভূ-ভারতে কোথাও ঘটেনি। ২০১১ থেকে ২০১৬ আর এস এস-র শাখার সংখ্যা ৫৮০ থেকে ১৪৯২ টিতে গিয়ে পৌঁছেছিল। বৃদ্ধির হার ১৫৭ শতাংশ। বর্তমানে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

**রাজ্যে বেড়েছে দু'ধরনের মৌলবাদ**

সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু দুই ধরনের মৌলবাদই গত চার বছরে সার, জল পেয়েছে এই রাজ্যে। খাগড়াগড়কাণ্ডে তা স্পষ্ট হয়েছে। কীর্ণাহারে উগ্রপন্থীরা ডেরার বেঁধেছিল। সেই ডেরায় মাত্র এক কিমি. দূরে, কীর্ণাহারেই আর এস এস শিবির করেছে। ঐ সময়ে জামাতের অস্ত্র পাচার চক্র আর সঙ্ঘের 'হিন্দুত্ব'র প্রচার একই সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে গোপনে।

এছাড়াও সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক অভিযানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সশস্ত্র রামনবমী উদ্‌যাপন, হনুমান জয়ন্তী, গো-দান, ব্রাহ্মণ সেবা সহ সব কার্যকলাপ রাজ্যের শাসকদল করে। সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার কারণে হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে, গান্ধী হত্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে এবং একই সাথে মুসলিম মৌলবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কেও রাজ্যের শাসকদল নিশ্চুপ থাকে।

ক্ষমতায় এসে ইমাম এবং মোয়াজ্জেমনের সামান্য কিছু টাকা ভাতা চালু করে প্রকৃত পক্ষে সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে টাকা কমিয়ে রাজ্য সরকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের শতকরা হার, দেশের গড় হারের থেকে বেশি হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিন্দু, তাই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে এই অংশের মানুষকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা জরুরী। স্রেফ সরকারী প্রচার দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখা যাবে না এটা কেন্দ্রের এবং রাজ্যের উভয় শাসকের অভিজ্ঞতা। এর জন্যই হয়তো প্রয়োজন প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার। মানুষকে বাস্তব থেকে দূরে রাখতে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহারের কৌশলকেই হাতিয়ার করা হলো। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই কাজ আগে থেকেই করেছিল তৃণমূল। এবার তারা বিজেপির দেখানো পথে হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু করলো। রামনবমী উপলক্ষে বিজেপি সশস্ত্র ধর্মীয় মিছিল করলে, পাল্টা ধর্মীয় মিছিল শাসকদলের। বিজেপি হনুমান জয়ন্তী পালন করলে তৃণমূলও তাই করে। বিজেপি রথযাত্রার আয়োজন করলে তৃণমূল তাকে ঠেকাতে পাল্টা যাত্রার উদ্যোগ নেয়। আর এস এস অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙা ও রামমন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে যে কাণ্ড করেছে, একইভাবে গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রমকে নিয়ে আবেগ তৈরি করতে সেই কাজ করতে চায় তৃণমূল।

এই ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার বিষময় পরিণতিতেই পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বেশ কিছু জায়গায়।

**প্রসঙ্গ ঃ রামমন্দির**

বাবরি মসজিদের জায়গায় কোনো রামমন্দির ছিল ইতিহাসে এমন প্রমাণ নেই, এটাই প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের সুচিন্তিত মতামত। রামায়ণ মহাকাব্যের আদি রচয়িতা বাল্মিকীর মহাকাব্যে তো নয়ই, এমনকি অনেক পরবর্তীকালে রচিত তুলসীদাসের রামায়ণেও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল বি বি লাল এবং অতিরিক্ত জেনারেল কে ডি সুন্দর রাজন দীর্ঘকাল এ নিয়ে গভীর সমীক্ষা চালিয়েছেন। কোনো প্রমাণ পাননি। বরং ২০০৩ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট নির্দেশিত স্থানের খনন কাজের অপ্রকাশিত

▶▶ *ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে*

# উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মৌলবাদী অপপ্রচার

**ভারতে মুসলমানরাই ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে**

এই অপপ্রচার উদ্দেশ্যমূলক, এর সাথে বাস্তবের সম্পর্ক নেই। বিগত দুটি সেন্সাসের পরিসংখ্যান বলছে যে হিন্দু-মুসলিম উভয়ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে, মুসলিমদের ক্ষেত্রে তা অপেক্ষাকৃত বেশি কমেছে। ২০০১-২০১১, সর্বশেষ জনগণনার তথ্য অনুসারে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২৪.৬ শতাংশ। আগের জনগণনায় (১৯৯১-২০০১) এই হার ছিল ২৯.৫১ শতাংশ। হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে (সর্বশেষ জনগণনা অনুসারে) ১৬.৮ শতাংশ। এর আগের জনগণনায় তা ছিল ১৯.৯২ শতাংশ।

**মুসলমানদের জন্য পৃথক পারিবারিক আইন থাকবে কেন? অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (কমন সিভিল কোড) চালু হবে না কেন?**

মুসলিম, খ্রীস্টান, পার্শী, ইহুদি প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসী মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক আইন ভারতে চালু আছে। এমনকি হিন্দুদের মধ্যেও। স্থান ও সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত আইন (পার্সোনাল ল) চালু আছে। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে বলা আছে সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথা। সুপ্রিম কোর্টও এই সাংবিধানিক নির্দেশকে রক্ষা করে। কিন্তু এটা করতে গেলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এর উপযোগী সচেতনতা সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। হিন্দু কোড, হিন্দু বিবাহ আইন, হিন্দু যৌথ পরিবার আইন প্রভৃতিতে এমন কিছু সংস্থান আছে যা হিন্দু মহিলাদের স্বার্থবিরোধী। তারও পরিবর্তন প্রয়োজন। তাছাড়া সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে সরকারের পালনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সব বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি বহুবিধ নীতি বর্ণিত আছে। বিগত সাত দশকে সরকার কর্তৃক তা অগ্রাধিকার পায়নি, বরং বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে দেশে অভিন্ন বিধি প্রণয়নের জন্য সরকার চেষ্টা করবে। গণপরিষদে বিতর্কের সময় আম্বেদকর বলেন, এই বিধি বাঞ্ছনীয়, তবে এখন তা থাকবে স্বেচ্ছামূলক অর্থাৎ সব অংশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি এবং লিঙ্গ, জাত, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদি বৈষম্যের অবসানের মধ্য দিয়ে সকল নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু করতে হবে।

বর্তমান সরকারের আমলেই ল কমিশন লক্ষাধিক মতামত নিয়ে এখনই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু না করে জোর দিয়েছে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটানো, সামাজিক সুবিধার প্রতিষ্ঠা এবং লিঙ্গ সমতার মাধ্যমে পারিবারিক আইনগুলিকে শক্তিশালী করার ওপর। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
47th Year, 10th Issue, February 2019

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

# সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা দিল্লীতে বি টি আর ভবনে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন।

তিনি আন্তর্জাতিক জাতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংগঠনের করণীয়, দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করেন। গত ৮-৯ জানুয়ারি, ২০১৯ সারা দেশে ধর্মঘটে ২০ কোটি শ্রমিক, কর্মচারী ও শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণে নজিরবিহীন ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে কর্মচারীদের বলিষ্ঠতার সঙ্গে ধর্মঘট করার জন্য অভিনন্দন জানান। পশ্চিমবাংলার সন্ত্রাস মোকাবিলা করে ধর্মঘট সফল হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে প্রায় ছ'মাস ধরে সর্বত্র সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে।

জাতীয় মহিলা কনভেনশন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পার্লামেন্ট অভিযানের কর্মসূচী ভালো হয়েছে। তিনি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দেশের শাসকচক্রম দক্ষিণপন্থী শক্তি আর এস এস-বিজেপিকে শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সর্বত্র প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বলেন। এবং সাংগঠনিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন।

পরে ১৯টি রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা গঠনমূলক আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বক্তব্য রাখেন সুতপা হাজরা। এরপর জবাবী বক্তব্য রাখেন এ শ্রীকুমার। সভা পরিচালনা করেন চেয়ারম্যান এস লাম্বা।

এই সভা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—

(১) আগামী লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে শ্রমিক-কমচারী এবং সাধারণ মানুষের অনুকূলে নিয়ে আসার উদ্যোগে শামিল হতে হবে। (২) দিল্লীতে হেড কোয়ার্টার্স বিল্ডিং ক্রয় করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। বকেয়া নির্ধারিত অর্থ অবিলম্বে জমা দিতে হবে। (৩) সংগঠনের সদস্য চাঁদা, সংগঠন তহবিল ও এমপ্লয়িজ ফোরামের বকেয়া টাকা জমা দিতে হবে। (৪) কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভা ১-২ জুন, ২০১৯ চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত হবে। □

*স্কুল সার্ভিস কমিশন (এস এস সি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন না। এর প্রতিবাদে অনশন কর্মসূচীতে শামিল হয়েছেন তাঁরা। রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত উপেক্ষা সত্ত্বেও এই কর্মসূচী ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শারীরিক অসুস্থতা, এমনকি সন্তান সম্ভবা চাকরিপ্রার্থীর গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অনমনীয় মনোভাবকে রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ কুর্ণিশ জানাচ্ছে। গত ২২ মার্চ ২০১৯ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ এবং যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী তাঁদের পাশে উপস্থিত থেকে তাঁদের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।*

## মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ ১৪/১৯ তারিখ ঃ ১৫/০৩/১৯

মাননীয়
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক,
পশ্চিমবঙ্গ,
মহাশয়,

দেশের আসন্ন সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পর নির্বাচন বিধি অনুযায়ী রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মচারীরা সমস্ত স্তরের নির্বাচনী প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডসহ নির্বাচনের সময় কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য আপনার নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ববদ্ধ ও নিয়োজিত থাকবেন।

অতীতে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারী সমাজ নির্বাচনী বিধি কার্যকরী করে অবাধে নিরপেক্ষ সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনী কাজ পরিচালনা করে আসছে যা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন দ্বারা একাধিকবার প্রশংসিত হয়েছে।

আমাদের রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত কয়েকটি নির্বাচনে বিশেষ করে শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে লক্ষ্য করা গেছে এবং সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন, ব্যাপক সন্ত্রাস ও ভোট কর্মীদের উপর বুথে বুথে নৃশংসভাবে আক্রমণ সংঘটিত করা হয়েছে। এমনকি একজন প্রিসাইডিং অফিসার, শিক্ষক মহাশয় নির্মমভাবে নৃশংসতার বলি হয়েছেন, যা প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারী সমাজ ও তার পরিবারকে আতঙ্কগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে নির্বাচনী দপ্তরগুলিও কর্মচারীদের নির্বাচনী কাজে যুক্ত করার ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসেবে ঠিক করা হচ্ছে কর্মচারীদের সাংগঠনিক অনুগত্যকে যা আমাদের কাছে অনভিপ্রেত ও ভয়াবহ দিক। অন্যদিকে নিয়মিত কর্মচারী ছাড়া সরাসরি নির্বাচনের কাজে অন্য কেউ যুক্ত হলে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

স্বাভাবিকভাবে একাংশের আধিকারিকসহ কর্মচারীরা নিষ্ঠার সাথে নির্বাচনী কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের দ্বারা নৃশংসভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। কর্মচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নির্বাচনী কাজ পরিচালনা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি কর্মচারীদের পরিবারের মধ্যেও আতঙ্ক ও ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশাসনের কাছ থেকে নিরাপত্তার কোনোরূপ নিশ্চয়তা বা প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় সমগ্র প্রশাসনের অভ্যন্তরে ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা ও দারুণ হতাশার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে নির্বাচনী কাজে যুক্ত কর্মচারীদের প্রশাসনিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানসহ সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করছি। পাশাপাশি উল্লিখিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় ও সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে আপনার সাথে আলোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নির্ধারণ করার অনুরোধ করছি।

এই প্রসঙ্গে একটি জরুরি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির আসন্ন সম্মেলনকে (১৬-১৭ মার্চ, ২০১৯) ঘিরে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে যে সকল পোষ্টার / হোর্ডিং, তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে তা অতি তৎপরতার সঙ্গে নষ্ট / ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই কাজ কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ ব্যাপারে আমরা আপনার হস্তক্ষেপ দাবি করছি।

আশা করি এই বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে আপনি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনের লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদ সহ,

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

## ডব্লু বি এম ও এ শতবর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী কর্মসূচী

স্বাধীনতার পূর্বে ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (ডব্লু বি এম ও এ)। বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ আন্তর্জাতিক ভাষাশহীদ দিবসে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সমিতির শতবার্ষিকী প্রতিপালনের কর্মসূচী শুরু হয়। ঐদিন শিয়ালদহে অবস্থিত সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে কর্মচারী ও অনুগামীদের নিয়ে ১০০ লালঝাণ্ডা সামনে নিয়ে দীর্ঘ মিছিলশুরু হয়ে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল উদ্বোধন করেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নকুল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট সভাগৃহে মূল কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে হুগলী জেলা দগরপাড়া, পোলবার, সিদু কানহু খেরওয়াল আশ্রমের বাসিন্দাদের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য নৃত্য পরিবেশন সমগ্র জায়গা জুড়ে চলতে থাকে। মূল মঞ্চেও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এরপর উদ্বোধনী গীতি আলেখ্য পরিবেশন করা হয়, শতবর্ষ সাংস্কৃতিক উপসমিতির পক্ষ থেকে। ১০০টি লাল আলো জ্বালিয়ে সভার উদ্বোধন করেন সিআইটিইউ-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা উদ্বোধক তপন সেন। তপন সেন তাঁর বক্তব্যে এই সমিতির তথা এ রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং সংগ্রামী ভূমিকার উল্লেখ করেন। পাশাপাশি বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে সারা দেশজুড়ে এবং এ রাজ্যেও শ্রমিক কর্মচারীদের ওপর যে ভয়াবহ আক্রমণ নেমে আসছে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এছাড়াও ওই সভায় বক্তব্য রাখেন শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি সুবিমল সেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে সুমিত ভট্টাচার্য এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুখেন কুণ্ডু। □

## মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ ০৯/১৯ তারিখ ঃ ২৬/০২/২০১৯

মাননীয়া
মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ,
নবান্ন, হাওড়া

**বিষয় ঃ চুক্তির মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে**

মাননীয়া,

আপনি অবহিত আছেন যে, রাজ্য প্রশাসন, বিধিবদ্ধসংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে লক্ষ লক্ষ স্থায়ী পদে পি-এস-সি বা পরীক্ষাগ্রহণকারী স্বয়ংশাসিত সার্ভিস কমিশনগুলির অধিকার খর্ব করে স্বচ্ছতার সাথে নিয়মিত নিয়োগ না করে নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চুক্তির মাধ্যমে নিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এতে যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরি প্রার্থীরা স্থায়ী চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সম্প্রতি, অর্থ দপ্তর থেকে প্রকাশিত আদেশনামায় (মেমো নং ঃ ১০৩৩-এফ(পি২) তারিখ ঃ ৮.২.২০১৯) সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত অস্থায়ী / দৈনিক মজুরি ভিত্তিক / চুক্তির কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিসহ অবসরকালীন সময়ে এককালীন অর্থ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উক্ত আদেশনামার মধ্য দিয়ে কিছু সংশয় তৈরি হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রথমত, নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির দাপটে সাধারণ জনগণের সঙ্গে রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ন্যায় এই অংশের কর্মচারীরাও নিদারুণ অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি অতি সামান্যই বলে আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে, মহামান্য উচ্চতম বিচারালয়ের নির্দেশক্রমে চুক্তিপ্রথায় ও অস্থায়ীপদে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম ১৮,০০০ টাকা মজুরি প্রদান করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, উক্ত আদেশনামায় অস্থায়ী মাধ্যমিক বা তদূর্দ্ধ যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের ৩ বছর সময়কাল পূর্ণ হলে গ্রুপ-সি পদের সুযোগ কার্যকরী করার কথা বলা হয়েছে। সরকারী চাকরির প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থীকে ন্যূনতম ৩ বছর সময়কাল পূর্ণ করার মধ্য দিয়ে স্থায়ী কর্মচারী ঘোষণা করা এবং তা পরবর্তীতে তিনি পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হন। এক্ষেত্রে চুক্তি বা ক্যাজুয়াল কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ না করে কি প্রক্রিয়ায় তাদের গ্রুপ-সি পদের বেতন নির্ধারণ করা হবে তার নির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, ঐ আদেশনামায় বলা হয়েছে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রুপ-ডি পদে নিযুক্ত চুক্তি ভিত্তিক বা ক্যাজুয়াল কর্মচারীদের ৩ বছর অতিক্রম করলেই গ্রুপ-সি পদের বেতন পাওয়ার অধিকারী। অথচ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন স্থায়ী পদে গ্রুপ-ডি কর্মচারীরা দীর্ঘদিন আপেক্ষমান থাকা সত্ত্বেও গ্রুপ-সি পদে পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন যা বর্তমান আদেশনামার মধ্য দিয়ে সম ক্যাডারের কর্মচারীর মধ্যে বিপুল বৈষম্য সৃষ্টি করবে।

চতুর্থত, স্থায়ী পদে নিযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রুপ-ডি কর্মচারীরা একটি নির্দিষ্ট ক্যাডারের (অবরবর্গীয় সহায়ক/করিণক বা এল ডি এ/এল ডি সি) সৃষ্ট পদে মাত্র ১০ শতাংশ গ্রুপ-সি পদে পদোন্নতির সুযোগ পেতে পারেন অথচ এই আদেশনামায় যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের ৩ বছর পূর্ণ হলেই ঢালাওভাবে গ্রুপ-সি পদে মজুরী পেতে পারবেন। এটাও দারুণভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করবে।

পঞ্চমত, প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে অধিকাংশ ক্যাজুয়াল বা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োজিত হলেও তাদের সুনির্দিষ্ট ক্যাডার হিসেবে নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমানে এই আদেশনামা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বিভাগীয় জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

ষষ্ঠত, স্থায়ীপদে নিযুক্ত চুক্তির কর্মচারীরাই কেবলমাত্র এই অর্থনৈতিক সুযোগে আওতায় আসবেন। এর বাইরেও বিপুল সংখ্যক চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী যাঁরা বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত আছেন তারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন, যা কাম্য নয়।

সপ্তমত, স্থায়ী পদে স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে চুক্তির মাধ্যমে নিয়োগের মধ্যে দিয়ে কার্যত স্থায়ী পদ অবলুপ্তির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে। এই ধরনের প্রক্রিয়ার অনতিবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন নতুবা প্রশাসনের সর্বস্তরে এক নৈরাজ্য তৈরি হবে।

আশা করি পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে আপনি এই বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করবেন। একই সঙ্গে চুক্তির কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে স্থায়ী কর্মচারীর ন্যায় সমকাজে সমবেতন ও সমমর্যাদা প্রদানে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদ সহ,

ভবদীয়
বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।